দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

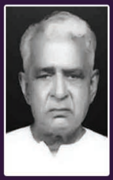

ভাষাশহিদ ধীরেনবাবুর দুঃসাহসের পুরস্কার একুশে ফেব্রুয়ারি — পৃঃ ১৫

সত্যাগ্রহের নামে দেশদ্রোহিতার নোংরা ষড়যন্ত্রে মেতেছেন মুখ্যমন্ত্রী—পৃঃ ২৭

৭১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।। ৫ ফাল্গুন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ধরনার নাটক করেও বাঁচানো গেল না রাজীব কুমারকে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৫ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৮ ফেব্রুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
উত্তরবঙ্গের জনসুনামিতে কল্পতরু প্রধানমন্ত্রী □ ৬
খোলা চিঠি : দিদি যাবেন দিল্লি, সঙ্গে যাবে কে!
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭
ঋণ মকুবের রাজনীতিতে পঙ্গু হবে অর্থনীতি
□ জি বি রেড্ডি □ ৮
দেশবিরোধী শক্তির মদতে উত্তর-পূর্বে ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলি □ সাধন কুমার পাল □ ১০
চীনের উইঘুর ও সরকার কর্তৃক তার মোকাবিলা
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৩
ভাষাশহিদ ধীরেনবাবুর দুঃসাহসের পুরস্কার একুশে ফেব্রুয়ারি
□ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ১৫
মমতা ব্যানার্জির সব চালই এখন ভেস্তে যাচ্ছে
□ অমিতাভ মিত্র □ ১৭
শিলংয়েই কি লেখা হবে শেষের কবিতা?
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৩
সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে মমতা কি নিজেই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা চাইছেন? □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২৫
অভিযুক্ত পুলিশ কমিশনারকে বাঁচাতে ধরনা— সত্যাগ্রহের নামে দেশদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন মুখ্যমন্ত্রী
□ সনাতন রায় □ ২৭
বিস্মৃতির অন্তরালে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ধারণকারী গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার □ সমীর চট্টোপাধ্যায় □ ৩১
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি একপাও ছেড়ে যাওনি
□ সারদা সরকার □ ৩৪
গল্প : অনামা সন্ন্যাসী □ প্রবাল চক্রবর্তী □ ৩৫
এবারের বাজেট জাতীয় অর্থনীতিতে দিনবদলের দিক্‌নির্দেশক
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ৪৩
মাতৃশক্তির উত্থান না হলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৯** □
নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **রঙ্গম : ৪৯**□
সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশিত হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতরত্ন নানাজী দেশমুখ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাঁদের ওপর সবথেকে বেশি ভরসা করতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নানাজী দেশমুখ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক, রাজনীতিতে এসেছিলেন সঙ্ঘের নির্দেশে। পেয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ১৯৬৭ সালে উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনসঙ্ঘের বিধায়ক সংখ্যা পৌঁছেছিল একশোয়। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক সাফল্য দিয়ে নানাজী দেশমুখকে বিচার করলে চলবে না। তিনি ছিলেন সামাজিক আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ। মধ্যপ্রদেশের অখ্যাত গ্রাম গোন্ডা আদর্শ গ্রাম হয়ে উঠেছিল তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে। সম্প্রতি ভারত সরকার নানাজী দেশমুখকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় তাঁকে নিয়েই। লিখবেন তরুণ বিজয়, ধর্মানন্দ দেব প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কেঁচো খুঁড়িতে কেউটে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটির প্রতি যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল নহেন তাহা আর একবার তিনি প্রমাণ করিলেন। সারদা চিটফান্ড তদন্তে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দেশবাসীর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছে। কেননা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণ অভূতপূর্ব তো বটেই, যথেষ্ট নিন্দনীয়ও। তাঁহার নির্দেশে কলিকাতা পুলিশবাহিনী শুধুমাত্র যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চলা তদন্তকার্যে বাধা দিয়াছে তাহাই নহে, ওই অধিকারিকদের নক্কারজনকভাবে বলপূর্বক থানায় লইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে স্তম্ভিত করিয়াছে, বাকরুদ্ধ করিয়াছে। এইটুকুতেই অবশ্য ক্ষান্ত দেন নাই তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, রাজ্যের নিরাপত্তা উপদষ্টা সুরজিৎ করপুরকায়স্থ, কলিকাতা পুলিশের আধিকারিক অনুজ শর্মা সহ পারিষদদের লইয়া ধর্মতলায় ধরনায় বসিয়াছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত চন্দ্রবাবু নাইডু, কানিমোঝি, তেজস্বী যাদবের মতা নেতা-নেত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া ধরনা মঞ্চে ভিড় বাড়াইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইরূপ আচরণ করিতে পারেন কি না? এই আচরণ কতখানি সংবিধান সম্মত?

মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার সঙ্গে ধরনায় অংশগ্রহণকারী আইপিএস অফিসাররা ধরনায় বসিবার পূর্বে এটি মনে রাখিলে বাঞ্ছনীয় হইত যে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ীই কোনো কর্মরত আইপিএস অফিসার কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সঙ্গে ধরনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। করিলে তাহা সংবিধান বিরোধী যেমন হয়, তেমনই সরকারি সার্ভিস রুলটিও অমান্য করা হয়। তদুপরি, রাজীর কুমার এবং ধরনায় অংশগ্রহণকারী অন্য দুই পুলিশ আধিকারিক আইপিএস অফিসার হিসাবেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাদের যেভাবে ধরনায় বসাইয়াছেন এবং তাঁহারাও সোৎসাহে বসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে, কোনো সরকারি আইনকানুন নিয়মনীতির তোয়াক্কা ইঁহারা করেন না। আইনের রক্ষকই এখন আইনভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পুলিশ কমিশনারের বাড়ির সামনে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা দেখিয়াছেন-- কী উত্তেজিত ভঙ্গীমায় মুখ্যমন্ত্রী ওইদিন রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তাতাইতেছিলেন। ফলে এই প্রশ্নও করা খুব অসঙ্গত হইবে না যে, একজন মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁহার রাজ্যের পুলিশকে কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করিতে পারেন? এই আচরণ কি সংবিধান সম্মত? অবশ্য যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন তিনি এই পশ্চিমবঙ্গকে ভারত রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, তবে অন্য কথা। তিনি কী ভাবিতেছেন সেইটিও এখন স্পষ্ট হওয়া দরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর ধরনায় বসিবার উদ্দেশ্যটি কি রাজনৈতিক, না নিতান্তই ব্যক্তিগত তাহা লইয়াও প্রশ্ন উঠিতেছে। ধরনা মঞ্চে বসিবার যে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার বুঝাই যাইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী যতই 'বিজেপির ষড়যন্ত্র' বলিয়া গালি পাড়ুন না কেন, এই তদন্তটি যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হইতেছে তাহা সকলেই অবগত। তদুপরি, বিজেপি সরকারে আসিবার পূর্বেই সারদা চিটফান্ড সংক্রান্ত এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করিয়াছিলেন কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান এবং আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। কিন্তু একটি বিষয় কাহারও কাছে পরিষ্কার হইতেছে না--যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'সততার প্রতীক' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি সিবিআই তদন্ত রোধ করিতে এত সক্রিয় কেন? কেঁচে খুঁড়িতে কেউটে বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কা কি তিনি করিতেছেন?

সুভাষিতম্

উদ্বেগং কলহং কণ্ডুং দ্যূতং মদ্যং পরস্ত্রিয়ঃ।

নিদ্রা মৈথুনমালস্যং সেবতে তর্হি বর্ধতে।। (চাণক্যনীতি)

উদ্বেগ, কলহ, চর্মরোগ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, পরস্ত্রী সম্ভোগ, নিদ্রা, মৈথুন ও আলস্যে যত অনুরাগ জন্মাবে, ততই এগুলির বৃদ্ধি ঘটবে।

উত্তরবঙ্গের জনসুনামিতে কল্পতরু প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ গত ৮ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ঘিরে ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে জনসুনামি আছড়ে পড়ে। কেউ বলছে চার লক্ষ আবার কারো মতে সংখ্যাটা পাঁচ লক্ষের কম নয়। এদিনের সভায় আসা কয়েকজনের প্রতিক্রিয়াতেও জনসুনামির আভাস।

প্রধানমন্ত্রীকে বরণের আয়োজনে ছিল উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া। তবে উত্তরবঙ্গের মানুষ দেখেছে।

সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য বহুকাঙ্ক্ষিত বহু প্রতিক্ষিত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন করলেন। এই সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোচবিহার, দার্জিলিং কালিম্পং-সহ এই এলাকার মানুষকে এখন আর কলকাতা ছুটে যেতে হবে না। মামলা জলপাইগুড়িতেই হবে।

ঘরের মানুষ হয়ে উঠেন। বলেন, 'আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক চায়ের সম্পর্ক। আপনারা চা উৎপাদন করেন আর আমি ছিলাম চা-ওয়ালা'। এখনকার চা শ্রমিকরা পেনশন পাবেন। ভারত সরকার সস্তায় রেশন দিচ্ছেন। এই রেশনের সুযোগ চা শ্রমিকরাও পাবেন। প্রধানমন্ত্রী মুখে এই ঘোষণা শুনে অনেক চা শ্রমিকের চোখে আবেগে জল চলে আসে। যেন

বিধাননগরের আনারস চাষিদের উপহার ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রধানমন্ত্রী সভাস্থলে এসে পৌঁছেছেন বেলা সাড়ে তিনটেয়। হালকা বৃষ্টি, বাতাস, সুদীর্ঘ অপেক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসের চোখরাঙানি কোনো কিছুই উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগকে উৎসাহকে দমিয়ে দিতে পারেনি। সভাস্থল থেকে মুহুর্মুহু মোদী মোদী আওয়াজ উঠছে। সভায় যাতে মানুষ আসতে না পারে তার জন্য তৃণমূল ও প্রশাসন বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। গাড়ির মালিক, কর্মচারী থেকে শুরু করে আমজনতা সবাইকে মোদীর সভায় গেলে ভয়ংকর পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, মারধোর করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় সভায় আসার অপরাধে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। সভার দিন ময়নাগুড়ির চারদিকে ২০/৩০ কিলোমিটার দূরত্বে তৃণমূল কংগ্রেস স্থানীয় নেতামন্ত্রীদের দিয়ে সভা করিয়েছে যাতে মানুষ মোদীজীর সভামুখী হতে না পারে। সভায় এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে এমন কিছু খবরও আসছে। দূরদুরান্ত থেকে সভায় আসার সময় তৃণমূলের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ'য়ে শ'য়ে গাড়ির কনভয়ের মতো একত্রিত হয়ে সভাস্থলের দিকে যাচ্ছে এই দৃশ্যও

কলকাতায় গিয়ে মামলা করার জন্য উত্তরবঙ্গের মানুষের অনেক টাকা খরচ হতো এখন আর হবে না।

পাশাপাশি ফালাকাটা থেকে সলসলাবাড়ি পর্যন্ত ৩১ডি জাতীয় সড়ককে চার লেনের কাজ শুরু করার ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির জন্য খরচ হবে দুই হাজার কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী এটাও উল্লেখ করেন যে এশিয়ান হাইওয়ে ২ এবং ৪৮-এর কাজ চলছে। এই প্রকল্পের জন্য হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। মহাসড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হলে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন চার লেনের জাতীয় সড়ক উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের পথ মসৃণ হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। কেন্দ্রের দেওয়া অর্থে পশ্চিমবঙ্গে ২৩ লক্ষেরও বেশি এবং জলপাইগুড়িতে ৬৫ হাজারেরও বেশি মানুষ পাকা ঘর পেয়ে গিয়েছেন। যারা পাননি তারাও পাবেন। ২০২২ পর্যন্ত দেশে এমন একটি পরিবারও থাকবে না যাদের পাকা ঘর নেই।

চা শ্রমিকদের পেনশন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করার সময় প্রধানমন্ত্রী যেন উত্তরবঙ্গের অনেকদিন বাদে ওদের যন্ত্রণার কথা কেউ অনুভব করতে পারলো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী জীবন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনা যোজনার মাধ্যমে গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ২ লক্ষ বিমা হয়েছে। দুটি যোজনার মাধ্যমে ৩০ হাজার ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই যোজনার কাজ পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুরু হয়েছিল। মানুষকে সহায়তা করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এই সমস্ত যোজনার প্রসার ঘটানো। এখানে গরিব মানুষকে সিন্ডিকেট রাজের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিদি দিল্লি যেতে চাইছেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যারা গরিব মানুষের পয়সা লুটেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের হয়ে দিন দুপুরে ধরনায় বসছেন। চিটফান্ড কাণ্ডে যারা সর্বস্ব হারিয়ে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তাদের পরিবার প্রশ্ন করছেন দিদি বর্তমান তদন্তে আপনি এত ভীত কেন? সারদা নারদা রোজভ্যালি কাণ্ডে যারা সর্বস্ব হরিয়েছেন তাদের বিশ্বাস ও ভরসা দিতে চাইছি যে চৌকিদার কাউকে ছাড়বে না। এই সরকার চুরি করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়াদের ধরে এনে দেশে ফেরাচ্ছে। দেশের ভিতরের চোরদের আইনের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছাবেই। ▌

দিদি যাবেন দিল্লি, সঙ্গে যাবে কে!

হে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীগণ,

ব্রিগেড আপনারা ভরাতে পারেননি। দিদি এত বড়ো একটা শো করলেন কিন্তু সেটা দেখার জন্য যাঁরা এলেন তাঁরাও ডিস্তাতের মর্যাদা না রেখে মাঝপথে উঠে গেলেন। এর পরে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের সভায় ভিড় হচ্ছে দেখে দিদির রাগ হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়! এমনকী বামেদের ব্রিগেডেও এত লোক!

দিদি রাজীবকে ভালোবেসে ধর্মতলায় ধরনায় বসলেন। সেখানেও আপনাদের উপস্থিতি খুবই খারাপ। এটাই বা কেন হলো। দিদি শেষে চন্দ্রবাবুকে ডেকে কোনোরকমে ধরনা তুলে মুখ বাঁচালেন। সবটাই তো আপনাদের জন্য। আপনারা একটু জমায়েত করলে দিদির এমন দিন আসত কি!

আমি জানি, আপনাদের মন ভালো নেই। দিদির জন্য কিছুটা, আর বাকিটা নিজেদের জন্য। এখন সিপিএম,কংগ্রেস থেকে যাঁরা আসছেন তাঁরাই দলের সবকিছু। আর আপনারা দিন দিন ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন। সামনে ভোট। বড়ো ভোট। আর তাতে নিজেরা নিজেদের হারাতে তৈরি হচ্ছেন যে সেটাও দিদি জানেন। মানে বুঝতে পারছেন। আসলে দিদি খুবই চিন্তায়।

একটা গোটা দলের চাপ নেত্রীর উপর। দলে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে সামলানোর দায়িত্বও তাঁর। কিন্তু এমন সব কাণ্ড হচ্ছে রাজ্য জুড়ে যে, সেসব সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। তার উপরে বিরোধীদের কটাক্ষ আর সমালোচনা। মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। কিন্তু সেটাই তো নেত্রীর পরীক্ষা। তাঁর মনের ইস্পাতের পরীক্ষা।

দিদি বুঝতে পারছেন কিছুই আগের মতো নেই। তিনি ভুল ল্যাজে পা দিয়ে ফেলেছেন। সিবিআই সামলাবেন না ভাইপো সামলাবেন সেটা ভাবতেই দিন-রাত এক হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য, জাতীয় নেত্রী হওয়ার জন্য যা করছেন সবই তিনি মনের অনিচ্ছায় করছেন। সত্যিই অভিনয় করছেন। প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইলেও পরোক্ষে বুঝিয়ে দেন যে, কোথাও যেন নেত্রী নিজেও বুঝতে পারছেন, যে প্রতিশ্রুতির ইমারত বানিয়ে তাঁর সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তা যথেষ্ট নড়বড়ে। সে ইমারতের শরীর থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা।

নারদা-সারদা কাণ্ডের প্রথম থেকেই দিদি কী করবেন বুঝতে পারেননি। সারদা এড়ানোর উপায় ছিল না কিন্তু নারদাকাণ্ডে প্রথমে গোটা ব্যাপারটাকে ষড়যন্ত্র বলে পরে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়টা মনে করুন। কুলটির সভায় উনি বলেছিলেন-- মানুষ অভিমান করলেও যেন আশীর্বাদের হাত না সরান। তার পরেই বউবাজারের সভায় জানান, যদি টাকা-পয়সা নেওয়ার বিষয়ে আগে জানতেন, অভিযুক্তদের ভোটে দাঁড়ানোর টিকিট দিতেন না। এর পরে বলে বসলেন-- সংসারে দু'একজন দুষ্টু ছেলে থাকতেই পারে, মা তো আর তাদের তাড়ান না। আবার কখনো কখনো নারদ-অভিযুক্তকে 'আমার প্রিয়' বলতেও দ্বিধা করেননি। তারপর পাটুলিতে পুরো উলটো সুরে গান-- 'চোর মনে হলে ভোট দেবেন না'। আর সবশেষে বেহালা চৌরাস্তার সভায় ঘোষণা করেন -- অন্যায় হলে যেন তাঁকে চড় মারা হয়, কিন্তু চোর বলে কুৎসা বা অপমান করা না হয়।

প্রশ্ন হলো, প্রকৃত মনোভাব কোনটা? কোনটা 'মন কি বাত'? ডায়ালগ কোনটা আর কোনটা বক্তব্য? না, ঠিক উত্তর আন্দাজ করতে পারার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। কারণ, হয়তো সবকটাই প্রকৃত উবাচ। আবার হয়তো বা পুরোটাই প্রলাপ। চাপ নেবেন না তৃণমূল ভাই-বোনেরা। রাজনীতির দাবি --' বাচ্চালোগ, বাজাও তালি'।

তালি দিন, তালি দিন। দিদি ওটাতে একটু সান্ত্বনা পান।

দিদি এখন নৈতিক জয় নিয়ে বই লিখবেন। আসলে উনি বুঝতে পারছেন, শুধু জয় মানে আসল জয় বুঝি আর সম্ভব নয়। আগামী এক বছরের মধ্যে তিনি তেরোটি নতুন বই লিখবেন বলে জানিয়েছেন বইমেলায়। তাহলে রাজনীতি করবেন কখন। জাতীয় রাজনীতি করতে হবে তো। আসলে টাকার দরকার। উনিই তো বলেছেন, তিনি কোনো কিছু থেকে টাকা নেন না। তাঁর লেখা বই আর গানের সুর থেকে তিনি নাকি রয়্যালিটির টাকা পান। আর তাতেই এত খরচ চলে যায়। সুতরাং, দিদির বই পড়ুন, দিদির লেখা ও সুর দেওয়া গান শুনুন। আর হাত যেন না থামে। হাততালি দিয়ে যান।

— সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

ঋণ মকুবের রাজনীতিতে পঙ্গু হবে অর্থনীতি

জি বি রেড্ডি

মধ্যভারতের তিনটি রাজ্যে কৃষিঋণ মকুবের অলীক প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের ভোটে জেতা দেখে মনে হয় বিষয়টিকে সঙ্গোপনে নির্বাচনী আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে কৃষকের দুর্দশা ও নিষ্কৃতির মহৌষধি হিসেবে ঋণ মকুব তবে কি ঘরে তৈরি কোনো রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ের সস্তা নিদান? নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক দলগুলি জনতার জন্য মুফতে কিছু না কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের কুকর্মের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতের তীব্রতা কেমন? দেখা যাক বিষয়টি কী ধরনের অর্থনৈতিক ডামাডোলের সৃষ্টি করে।

ঋণের মোদ্দা কথা :

প্রতি একর জমি পিছু ৫০ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়। কৃষিজমি বন্ধক রেখে জমির বাজার মূল্যের ৫০ শতাংশ ঋণও ব্যাঙ্ক দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রী কিনতে প্রতিবার চাষ অনুযায়ী একাধিক ফসল বাবদ একর প্রতি চার হাজার টাকা ও ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু আছে। এই কৃষিঋণ নিয়ে রাজনীতি করা আমাদের দেশে একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পূর্বতন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম যিনি জীবনে চাষ করেননি তিনি চাষিদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছেন অন্তত ২ একর জমি ১০ বছরের জন্য চাষ করে তারপর অনায়াসে ঋণ মকুবের দাবি জানাতে পারেন। এর মাধ্যমে যাঁরা কৃষিঋণ মকুবের বিপক্ষে সওয়াল করছেন চিদাম্বরম নির্লজ্জভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, যদি প্রান্তিক বা ছোটো চাষিদের ক্ষেত্রে ২ একর জমির জন্য কৃষিঋণ মকুব করা হয় তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু যারা প্রকৃত চাষি নয় তারা দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ এই ভাবে ঋণ মকুবের কৌশলে আত্মসাৎ করে দেশকে ঠকাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলি, আমি একজন কৃষক। বাস্তবে তিন বছর আগেও মাঠে চাষ করতাম। জাতীয় কৃষি উন্নয়ন পর্ষদের ৫ বছর সিনিয়র ভিজিটিং ফেলো হিসেবে আমার কৃষি সম্পর্কে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতা আছে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে (১) কৃষকদের নানা ভাগে চিহ্নিত করা, (২) বিভিন্ন ধরনের ফসলের প্রকৃতি, (৩) চাষের বিভিন্ন জলবায়ু ভিত্তিক অঞ্চল, (৪) কৃষিঋণ মকুব, (৫) ফসলের ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য, (৬) দেশের কৃষিনীতি ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ, (৭) অর্থনীতির ওপর ঋণ মকুবের প্রভাব।

প্রথমেই কৃষকদের প্রকারভেদের ওপর নজর দিলে দেখা যায় বিষয়টি বিতর্কিত। ছোটো চাষি অর্থাৎ যার ২ একর জমি, প্রান্তিক চাষি যার ৫ একর জমি, মধ্যম চাষি অর্থাৎ যার ১০ থেকে ২০ একর জমি আছে তাঁরা বড়ো কোম্পানির হয়ে বিশেষ করে plantation (চা, রবার ইত্যাদি) এঁরা সকলেই যখন ঋণ মকুবের আওতাধীন হন তখন এটি বড়ো ধরনের জালিয়াতি। ভাড়াটে কৃষকরা বড়ো বড়ো জমিদারদের হয়ে আধাআধি ভিত্তিতে জমি চাষ করেন। সেই জমিদাররাও ঋণ মকুবের পরিধির মধ্যেও রয়েছেন।

উল্লেখিত ভাগচাষিরা কিন্তু ঋণ মকুবের কোনো সুবিধে পাবেন না, তাদের তো চাষি হিসেবে চিদাম্বরম কোনো locus standi-র কথা বলেননি। এই ভাগচাষিরা কখনই ব্যাঙ্ক বা কোনো কৃষি সমাবায় ব্যাঙ্ক থেকে কোনো কৃষিঋণ পাবেন না। তারা জমি হাঙরের থেকে ১৮ থেকে ৩০ শতাংশের যাকে বলে চটা সুদে ধার নিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, ফসলের বহু বৈচিত্র্য রয়েছে যেমন— ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, রাগি বা নানা ধরনের ডাল, খাদ্যবস্তু নয় এমন চাষের অন্তর্গত তাড়াতাড়ি খারাপ হয় বা দীর্ঘদিন ঠিক থাকে, যেমন— তুলো, তামাক, বাদাম, কাজু, নানা ধরনের ফল ছাড়া সরষে, আদা, কফি, চা, রবার, নারকোল, পোস্ত, ফুল বহু কিছু রয়েছে।

তৃতীয়ত, অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেমন— খরা, সাইক্লোন বা ফসলের ওপর শিলাবর্ষণের ফলেও চাষি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় অত্যন্ত ঊষর অঞ্চলে প্রতি তিন বছর অন্তর খরার কবলে পড়ে তার সঙ্গে পঞ্জাব, হরিয়ানা বা নদীবিধৌত উচ্চ ফলনসম্পন্ন অঞ্চলের তুলনা চলে না।

চতুর্থত, আলোচিত বিন্দুগুলির ভিত্তিতে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তবেই কৃষিঋণ প্রদান ও পরে তার মকুবের প্রসঙ্গ আসা উচিত। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহু চর্চিত ড. স্বামীনাথন কমিটির সমীক্ষায় এই বিষয়গুলির বিশেষ উল্লেখ নেই।

অন্যদিকে, কৃষক লবির তল্পিবাহকদের যুক্তিটি অতীব সরল। সরকার যখন বড়ো বড়ো বহুদেশিক সংস্থাগুলিকে নানা ধরনের সুবিধে এমনকী কোম্পানি কর ও ঋণের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কৃষিঋণে ছাড় দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আজকের তারিখে সব ধরনের কৃষকই ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু কেন? গ্রামের সরপঞ্চ চাষিদের বলে থাকে ঋণ নিতে পারলে খরা, বন্যা হলেই ঋণ মাফ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কে জমির মালিকানা একবার চিহ্নিত হলে সবরকম ক্ষেত্রে তা আইন গ্রাহ্যতা পারে। কম সুদের কথা তো আছেই।

আজকের তেলেঙ্গানার কৃষিক্ষেত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে 'ঋতু বন্ধু প্রকল্পে' বছরে দু'টি চাষের জন্য ১০ হাজার

টাকা নিশ্চিত করে পেলেও তাদের অধিকাংশই ব্যাঙ্ক থেকে বাড়তি ঋণ নিয়ে থাকে। আগে বলা কর্পোরেট সংস্থা যারা সব ধরনের plantation ক্ষেত্রে চাষ করায় তারা কীভাবে কৃষিঋণ প্রকল্পের সুবিধে নেওয়াটা ন্যায়সঙ্গত মনে করবে! এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ফসলের নাম করা যায় যেগুলি কখনই ঋণমকুবের যোগ্যতা পেতে পারে না।

বিস্ময়ের কথা, শহরে বসবাসকারী মানুষজনের জাতীয় সড়ক বা রাজ্যসড়কের দু'ধারে বিস্তৃত জমিগুলি রিয়েল এস্টেট হিসেবে কিনে রাখার পর সেগুলি ভাগচাষি দিয়ে চাষ করিয়ে কীভাবে 'রিতু বন্ধু' বা কৃষিঋণের সুবিধে আদায় করা হয়? এটি কি এক ধরনের ঘৃণ্যতম জালিয়াতি নয়? বস্তুত ফসলের দাম সংক্রান্ত ন্যূনতম সহায়ক মুল্যের বিষয়টি দীর্ঘদিন আগেই চিহ্নিত হয়েছিল। আজকে হঠাৎ গজিয়ে উঠল এমনটা নয়। যেমন ধরুন প্রতিদিন টিভি খুললেই পেঁয়াজ, টমেটো, আলু ইত্যাদি সবজির চাহিদার থেকে বিপুল উৎপাদনের কথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচারিত হয়। পরিণতিতে এগুলির বিক্রয় মূল্য সহজেই পড়ে যায়। একজন পেশাদার চাষি হিসেবে আমাকেও কখনও কখনও নিলাম কেন্দ্রের টেবিলে টমেটোর বস্তা ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

২০০৬ সালে স্বামীনাথন কমিটি রির্পোটে চাষির দুর্গতি ও আত্মহত্যা বন্ধ করতে তিনি (১) ভূমি সংস্থার, (২) সেচ, (৩) ঋণ, (৪) শস্য বিমা ও খাদ্য নিরাপত্তার সুপারিশ করেন। একই সঙ্গে চাষিদের যথাযোগ্য কাজে নিযুক্তি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপরও জোর দেন।

সরকার ইতিমধ্যে ২২টি ফসলের বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম সহায়কমূল্য ঘোষণা করেছে। আখের জন্য ন্যায্য ও লাভমূলক মূল্য আলাদাভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে দানা শস্য ও ডাল চাষের খরচের ওপর কম করে যাতে ৫০ শতাংশ বাড়তি পাওয়া যায় সরকার স্বামীনাথন সুপারিশ মেনে তাও ঘোষণা করেছে। চীন বা দক্ষিণ কোরিয়ার চাষির উৎপাদনশীলতার তুলনায় আমাদের কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা প্রায় অর্ধেক। এ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা, কৃষি বিশেষজ্ঞ মাঠে নেমে চাষিকে সঠিক রাস্তা কখনও বাতলায়নি।

ফসল কাটা হয়ে যাওয়ার পর সহজগম্য স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি যাতে আলু, টমাটো বা লঙ্কার অতি উৎপাদন হলে তা যেন নষ্ট না করে দিতে হয়। অন্যান্য আরও নানান নির্দেশনামা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করায় প্রায়োমিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যের অভাব সত্ত্বেও কিছুটা রুপালিরেখা দেখা যাচ্ছে।

বাজেটে কৃষি সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের বিপণন ও ২২ হাজার গ্রামীণ কৃষি বাজার ৫৮৫টি Agricultural Produce market কমিটি নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্দেশে ২ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা যাদের কাছে বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো রকম প্রতিষ্ঠানগত সুবিধে নেই তাঁরা প্রভূত উপকৃত হবেন। এই সূত্রে operation green ঠিক operation food-এর অনুসরণে টমেটো, পিঁয়াজ বা আলুর দামের ভয়ঙ্কর নেমে যাওয়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হবে।

আলোচিত বিষয়গুলির নিরিখে কৃষিঋণ নিয়ে অর্থনীতিকে এড়িয়ে শুধুই রাজনীতি করা বস্তুতই বৌদ্ধিক দেউলেপনারই নামান্তর। নীতি আয়োগের বক্তব্য অনুযায়ী কৃষিঋণ মকুব কখনই চিরস্থায়ী সমাধান হতে পারে না। প্রতিশ্রুত ঋণ মকুবের অর্থের পরিমাণ (১) বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে ৭০ হাজার, (২) কংগ্রেস শাসিত ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান মিলিয়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি সমস্ত চাষির ঋণ সরকারের তরফে গ্রহণ করে নেবেন যার পরিমাণ ৬৭ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য এ পর্যন্ত পঞ্জাব সরকার ১৭৫০ কোটি টাকার ঋণ মকুব কাগজে কলমে করতে পেরেছে। কর্ণাটক সবেমাত্র চাষিদের চিহ্নিতকরণ শুরু করেছে। লোকসভা ভোটের দিকে নজর রেখে হয়তো আগামীদিনে কিছু মকুবনামা দিতে পারে। এই সূত্রে অর্থনীতিবিদদের যেটা ভাবাচ্ছে তা হলো, রাজ্যগুলির gross domestic product-এর শতাংশের হিসেবে রাজ্যের দেনা পঞ্জাবে ৩৩ শতাংশ ও মধ্যপ্রদেশ ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনীতির মানদণ্ডে এগুলি বিপজ্জনক প্রবণতা। অথচ এখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিরুপায় কেননা কৃষিক্ষেত্র ও সে সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিরই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের এই সস্তা অস্ত্র যা অর্থনীতিকে ধ্বংসের রাস্তায় নিয়ে যাবে তা থেকে সরে আসা উচিত। না হলে ঋণ মকুবের নামে বড়ো বড়ো মালিকের ভাগচাষিদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নির্ভেজাল জালিয়াতি চালিয়ে যাবে। ঋণ মকুব নিয়ে কৃষক লবির এই ঘৃণ্য খেলা এখুনি বন্ধ না হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়তে দেরি হবে না। ■

রাজনৈতিক দলগুলিরই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের এই সস্তা অস্ত্র যা অর্থনীতিকে ধ্বংসের রাস্তায় নিয়ে যাবে তা থেকে সরে আসা উচিত। না হলে ঋণ মকুবের নামে বড়ো বড়ো মালিকের ভাগচাষিদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নির্ভেজাল জালিয়াতি চালিয়ে যাবে। ঋণ মকুব নিয়ে কৃষক লবির এই ঘৃণ্য খেলা এখুনি বন্ধ না হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়তে দেরি হবে না।

দেশবিরোধী শক্তির মদতে উত্তরপূর্বে ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলি

সাধন কুমার পাল

পাকিস্তান বা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামিক গোষ্ঠীগুলির গতিবিধি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে ভয়ংকরতম গণহত্যা সংগঠিত করে ওই দেশগুলিকে হিন্দুশূন্য করাই নয় অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বৃহত্তর ইসলামিক প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তারা এখনো সক্রিয়। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিগড়ে দিয়ে কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করা তাদের রণনীতির অঙ্গ। ভূমিহীন হতদরিদ্র মুসলমান জনতার ভারতে অনুপ্রবেশের পেছনে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রয়েছে এই সমস্ত ইসলামিক গোষ্ঠীগুলির প্রত্যক্ষ সহায়তা। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আড়ালে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্যে মুসলমান তোষণের রাজনীতি ইসলামিক জেহাদিদের স্বপ্ন পূরণের পথে সহায়ক। স্পষ্টতই স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ভোটব্যাঙ্ক নীতির জন্য দেশভাগের পরও পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। জিন্না সাহেবের প্রেতাত্মারা অসমকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত করতে পরিকল্পনা করে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।

৭১ সালে বাংলাদেশ গঠনের সময় প্রায় ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে সর্বস্ব হারানো বাঙ্গালি হিন্দুরাও রয়েছেন। মনে করা হয় বাংলাদেশ গঠনের পর এদের সিংহভাগই ফিরে যাননি। সেই সঙ্গে অনুপ্রবেশও বন্ধ হয়নি। ১৯৫০ সাল থেকেই এই অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠে আসছে। কেন্দ্র সরকারের সম্মতিক্রমে তখন থেকেই নানা পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে। অভিবাসী (অসম থেকে উৎখাত আইন) আইন ১৯৫০, আইএমডিটি অ্যাক্ট, সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত-করণের জন্য 'ডি' ক্যাটেগরি ভোটার চিহ্নিতকরণ এই সমস্ত পদক্ষেপের অঙ্গ।

১৯৭৮ সালের ২৮ মার্চে লোকসভার সদস্য হীরালাল পাটোয়ারীর মৃত্যুর ফলে মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। সেই শূন্য সংসদ আসন পূরণ করার জন্য ১৯৭৯ শেষের দিকে সেই আসনে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে ওই বছরের এপ্রিল মাস থেকে নতুন ভোটারদের ভোটার তালিকাতে নামভুক্তির কাজ আরম্ভ করে। মে মাস অব্দি এই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অব্যাহত ছিল। কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোটার তালিকাতে প্রচুর অবৈধ বিদেশির নাম ঢুকে গেছে বলে এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বলা হয়, কংগ্রেস (আই) দল নিজের ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করতে কৌশলে সন্দেহজনক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকাতে ঢুকিয়েছে। এই অভিযোগ উত্থাপন করে পুরো অসম কাঁপিয়ে তোলে সারা অসম ছাত্র সংস্থা। এর আগে অসমে বিদেশি অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সারা অসম ছাত্র সংস্থা, সংক্ষেপে 'আসু' বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি রূপায়ণ করে আসছিল।

১৯৮০ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনের প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। এই সময়ে অসমের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৮৩ সালে জনসাধারণের কঠোর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও নির্বাচনে হিতেশ্বর শইকিয়া মুখ্যমন্ত্রী হন। এই আন্দোলনে অসমের নগাঁওয়ের নেলী নামক স্থানে অবৈধ বাংলাদেশিদের হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড নেলীর হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। নেলীর হত্যাকাণ্ডে প্রায় ১৮০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল ও আন্দোলনের সময়ে ৮৫৫ জন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮৫ সনের ১৫ আগস্ট আন্দোলনকারী নেতা ও রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার অসম চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্র, অসম সরকার, আসু ও এএজিএসপি-র মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় অসম চুক্তি। কেন্দ্রে তখন রাজীব গান্ধী সরকার। এই চুক্তি অনুসারে অভিবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমত, যাঁরা ১.১.১৯৬৬ সালের আগে অসমে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, যাঁরা ১.১.১৯৬৬ থেকে ২৪.৩.১৯৭১ সালের আগে অসমে এসেছে। তৃতীয়ত, যাঁরা ২৫.৩.১৯৭১ সালের পরে অসমে প্রবেশ করেছে। প্রথম ক্যাটেগরিতে থাকা ব্যক্তিরা নাগরিকত্ব পাবেন। পরের ক্যাটেগরির ব্যক্তিরা দশ বছর নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত থাকবেন। এবং তৃতীয় ক্যাটেগরিতে থাকা ব্যক্তিদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অটল বিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার ও অল অসম স্টুডেন্স ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষ হতেই এই কাজের জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েও দেওয়া হয়। এর পরেও এ ব্যাপারে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের তরফ থেকে কোনো সক্রিয়তা দেখা যায়নি। ২০০৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অসম সফরের সময় জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের দাবিতে অল অসম স্টুডেন্স ইউনিয়ন বয়কটের ডাক দেয়। এই দাবি মেনে নিয়ে ২০০৫ সালের ৫ মে মনমোহন সিংহের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত হয় ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এনআরসি আপডেটের কাজ শেষ করা হবে। কিন্তু সেবারও গৃহীত সিদ্ধান্ত হিমঘরে চলে যায়। ২০০৯ সালের ১২ জুলাই অসম পাবলিক ওয়ার্কস নামে একটি এনজিও সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করে দাবি করে যে

অসমের ভোটার তালিকায় ৪১ লক্ষ বিদেশির নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় গৃহসচিবের নেতৃত্বে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বরপেটা ও নয়গাঁও রেভিনিউ সার্কেলে এনআরসি নবীকরণের পাইলট প্রজেক্ট শুরু করা হবে। নয়গাঁওয়ে এই পাইলট প্রজেক্ট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও বরপেটায় অল অসম মুসলমান স্টুডেন্টস ইউনিয়নের বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে চার জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর এন আর সি নবীকরণের কাজ আবার হিমঘরে চলে যায়।

অবশেষে ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতায় কেন্দ্র ও বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে এনআরসি নবীকরণের কাজ শুরু হয়। গত ৩০ জুলাই এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে ৩ কোটি ২৯ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৭ জনের নাম খসড়াতে নেই। খসড়া প্রকাশের পর এই চল্লিশ লক্ষ মানুষের পরিচয় নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উঠে আসছে। বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট উস্কে দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলছেন এরা সবাই বাঙ্গালি। মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্য মুসলমান মহল্লা গুলিতে গিয়ে বলা হচ্ছে এই চল্লিশ লক্ষের সিংহভাগই মুসলমান। অর্থাৎ ভারতের স্থিতিশীলতা অখণ্ডতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এনআরসির মতো একটি গুরুতর বিষয় যেন সস্তা রাজনীতির উপাদানে পরিণত হয়েছে।

উগ্র অসমিয়া সেন্টিমেন্ট কিংবা সস্তা বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট সরিয়ে রেখে যদি এন আর সি নবায়নের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে ধর্মের ভিত্তিতে আবার যেন দেশভাগের পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেটি রোধ করাই এনআরসি-এর মূল উদ্দেশ্য। কেউ অসমিয়া ভাষায় কথা বললেই সে অসমিয়া হয়ে যাবে এই বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবার বাংলা ভাষায় কথা বললেই সে বাঙ্গালি এই বিভ্রান্তি থেকেও মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ভাষা যদি ঐক্যের ভিত্তি হতো তা হলে বাংলা এবং পঞ্জাব ভাগ করে দেশ ভাগ করতে হতো না। ভাষাগত পরিচয়ের আড়ালে নিজেদের স্বরূপ লুকিয়ে প্রভাব বিস্তার করা যে ইসলামিক জেহাদিদের পুরানো কৌশল এটা আজ প্রমাণিত সত্য। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা, নোয়াখালির দাঙ্গা, গ্রেটক্যালকাটা কিলিং, ১৯৪৭-এর দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালির উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাস একথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাষাগত নয় বাস্তবে হিন্দু মুসলমান ভারসাম্যই দেশের অখণ্ডতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থিতিশিলতা রক্ষার সবচেয়ে বড়ো রক্ষাকবচ। হিন্দু মুসলমান ভারসাম্যের তত্ত্বকে অস্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষার মতো মহান আদর্শ আওড়ে যে কোনও এলাকার স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব নয় তা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে হলে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে যেতে হবে। ভাষাগত পরিচয়ের আড়ালে নিজেদের প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে অনুপ্রবেশ, অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারের সাহায্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিণত করে ইসলামিক গণরাজ্যে পরিণত করা ইসলামিক জেহাদিদের অতি পরিচিত রণকৌশল। অসমের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি থেকে অসমিয়া হিন্দুদের নিরন্তর পলায়ন জেহাদিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সেই কৌশলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ভাষাগত পরিচয়ের রণকৌশলের সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রণকৌশল যুক্ত হওয়াতে দেশভাগের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের সাত দশক অতিবাহিত হয়ে গেলেও ভারতের চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা জেহাদিদের কৌশল মোকাবিলায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। সেই দিক থেকে এন আর সি জেহাদিদের কৌশল মোকাবিলায় একটি বড়ো সাহসী পদক্ষেপ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই এন আর সি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কতটা চিহ্নিত করতে পারলো? ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া বলেছিলেন অসমে ৩৩ লক্ষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ জয়সোওয়াল রাজ্যসভায় জানান যে ভারতে ১ কোটি ২০ লক্ষ, ৫৩ হাজার ৯৫০ জন অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। এদের মধ্যে অসমে রয়েছে ৫০ লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫৭ লক্ষ। বিভিন্ন সূত্র থেকে আসা তথ্য বলছে অসমে এন আর সি থেকে বাদ পড়া চল্লিশ লক্ষের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ২০ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান যা কিনা হিতেশ্বর শইকিয়া কিংবা প্রকাশ জয়সোওয়ালের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে অনেকটাই কম। হতে পারে ২০১০-এর পাইলট প্রজেক্টের পর অনুপ্রবেশকারীরা সতর্ক হয়ে গিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে রেখেছিল। বাকি অর্ধেকের মধ্যে অসমীয়া, বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু-সহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেন। এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে এনআরসি করেও অসমে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের সম্পূর্ণ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এনআরসি করেও অসমের জনসংখ্যার বিগড়ে যাওয়া ভারসাম্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই তিনটি দেশে অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, ক্রিস্টান, পার্শি এই ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ ভারতে প্রবেশ করলে তাকে উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর এই তিনটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অমুসলমানদের মানবাধিকার বলে কিছু নেই।

নয়। কংগ্রেস অসমে বিরোধিতা করার সাহস না পেলেও ত্রিপুরায় এনআরসি-র বিরুদ্ধে মিছিল করছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ আইনে পরিণত করে এনআরসি থেকে বাদ পড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে পারলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই তিনটি দেশে অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, ক্রিস্টান, পার্শি এই ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ ভারতে প্রবেশ করলে তাকে উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর এই তিনটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অমুসলমানদের মানবাধিকার বলে কিছু নেই।

অমুসলমানদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে এই দেশগুলিতে বিভিন্ন সময়ে নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে গণহত্যা। পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রায় হিন্দু শূন্য। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের কমবেশি ২৪ শতাংশ হিন্দু ছিল বর্তমানে তা ৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে যারা নির্যাতিত তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব প্রদানের ভাবনা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বেশ কিছু দল সংখ্যালঘু তোষণের লক্ষ্যে এই বিলে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি তুলছেন। আবার অনেকে এই বিলে বাঙ্গালি আধিপত্যের প্রশ্ন তুলে অসমিয়াদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কথা বলছেন। এই সমস্ত দাবির মধ্যে কোনওরকম ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবিকতা কিংবা অসমিয়া স্বার্থরক্ষার ভাবনা থাকতে পারে না। বরং বলা ভালো এই দাবির পেছনে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের মোড়কে লুকিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ, অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে মুঘলিস্থান গঠনের জন্য সক্রিয় ছদ্মবেশি ইসলামিক জেহাদিদের পরিকল্পিত রণনীতি। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের ক্ষত এখনো শুকোয়নি। যে সমস্ত মুসলমান শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান বুঝে নিয়ে সেখানে বসবাস করছে তাদের বা তাদের বংশধরদের আবার এখানে নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি তোলার অর্থ দেশভাগের ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

তবে শুধু এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ রূপায়ণ করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। ধর্মমত নির্বিশেষে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের বিধিও কঠোর ভাবে বলবৎ করতে হবে। ২০১৮-র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বলছে অসমের মানুষ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ইস্যুতে বিজেপির পাশেই আছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সাময়িক ভাবে পিছু হটলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সভায় পাশ হওয়ার পর অপচারের ঝড় তুলে আবার সংগঠিত হওয়ার কোনো সুযোগই যে হাতছাড়া করছে না তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেছে এই ইস্যুতে মানুষ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধীদের পক্ষে নেই। সুতরাং উত্তরপূর্ব ভারতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা সংগঠনগুলির সামনে একটিই পথ তা হলো বনধ, অবরোধ, হুমকি, ধমকিও মতো নেতিবাচক ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করা। শুধু অসম নয় এই ইস্যুতে সমস্ত উত্তরপূর্ব ভারতকে ক্ষেপিয়ে তুলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলার প্রয়াস হচ্ছে। বনধ মিছিল মিটিং সংগঠিত হচ্ছে।

এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে অপপ্রচারের ঝড় তোলা হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই অসমের নেতাদের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন যে কোনো মূল্যে নাগরিকত্ব বিলকে রাজ্যসভায় রুখে দেওয়া হবে। বিল বিরোধী মিছিলে ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ত্রিপুরায় তিন জনজাতি নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা পর্যন্ত করতে হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশকে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রাধাপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে ৩০ জানুয়ারি সভা করার সময় দেশ-বিরোধী 'বাই বাই ইন্ডিয়া হ্যালো চায়না' স্লোগান দেওয়া হয়। এদিকে ৮ ফেব্রুয়ারি শিলচরে মণিপুরি ইয়ুথ ফ্রন্ট অব অসম (মাইকা)-এর বাইক মিছিলে যোগ দিয়ে সুশান্ত রাজবংশী নামে এক যুবক 'ওয়েলকাম চায়না, গোব্যাক ইন্ডিয়া' স্লোগান দিয়েছিল। শিলচরেও পুলিশকে এই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে উদ্ভূদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস, বামপন্থী ও অগপর মতো আঞ্চলিক দলগুলির তাদের বক্তব্যে এই সমস্ত ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপের নিন্দা না করে উল্টে বিজেপিকেই দায়ী করছে। ফলে এটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই সমস্ত দলগুলি দেশবিরোধী শক্তিগুলির মদতে ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঠিক একই রকম ভাবে মূলস্রোতের এই সমস্ত দলের প্রশ্রয়েই উত্তরপূর্ব ভারতে ভারত বিরোধী শক্তিগুলি আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে গুয়াহাটির একটি জনসভায় দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ''আমরা অসমকে কিছুতেই দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে দিতে পারি না। সেটা যাতে না হয় তার জন্য অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা-সহ এই বিলের প্রয়োগ প্রয়োজন।'' বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অসমে হিন্দুদের জনসংখ্যা ১০ শতাংশ কমে গিয়েছে বলে দাবি করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। জানান, ১৯৭১ সালে অসমে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৭১ শতাংশ। ২০১১ সালে সেটি কমে হয়েছে ৬১ শতাংশ। আর বাংলাদেশ থেকে আসা ৮ লক্ষ হিন্দুকে বাদ দিলে সংখ্যাটা আরও কমবে। তখন হিন্দুদের জনসংখ্যা কমে মেরেকেটে দাঁড়াবে ৫২ শতাংশ। আর তখন বদরুদ্দিন আজমল অথবা সিরাজুদ্দিন আজমল হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একহাত নেন অর্থমন্ত্রী। তোপ দেগে বলেন, সংখ্যালঘুদের সংগঠন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই বিলের বিরোধিতা করার প্রচার করা হচ্ছে। যারা বিরোধিতা করছে তারা এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উদ্বাস্তু। কাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে আর কাকে দেওয়া হবে না সেটা বলার অধিকার এদের কে দিয়েছে? লোকসভা ভোটকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, যাদের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের রক্ত ঝরেছে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ পড়াচ্ছে'। বলার অপেক্ষা রাখে না আত্মঘাতী বাঙ্গালি হিন্দু ঘুমিয়ে থাকলেও তাদের নাগরিকত্বের জন্য লড়ছে অসমিয়ারা। এই লড়াই যে নতুন ভোরের বার্তা বহন করছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ■

চীনের উইঘুর সমস্যা ও সরকার কর্তৃক তার মোকাবিলা

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

প্রাচীন ইতিহাস :

উইঘুররা পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতি- গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়। তবে বর্তমানে তারা প্রধানত উত্তর-পশ্চিম চীনের স্বশাসিত জিংজিয়াং অঞ্চলে বাস করে। এতদ্ব্যতীত তাইওয়ান কাউন্টিতেও তারা বাস করে। তাদের আচরিত ধর্ম ইসলাম। কিন্তু আদিতে তা ছিল না। দশম শতাব্দীতে কার্লুগ, ইয়াগমাস, চিগিলস প্রভৃতি তুর্কি উপজাতিরা পশ্চিম তিয়েন শানের সেমিরেচাই ও কাশগরিয়াতে কারা-খানিদ খানেত স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে ট্র্যান্সক্সিয়ানা দখল করেন। সুলতান সাতুক বুঘরা খান তুর্কি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে কারাখানিদদের মুসলমানে রূপান্তরিত করেন। এরাই পরে উইঘুর সম্প্রদায় হন। খোতানের ইন্দো-ইউরোপীয় শক বৌদ্ধদের তুর্কি মুসলমান কারাখানিদরা একাদশ শতাব্দীতে জয় করেন তবে উইঘুররা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা সম্পূর্ণ মুসলমান হয়ে যায়। ভারতের হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পূর্বতন বৌদ্ধ ইউঘুরদের তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের শেখানো হয় যে কাফের কালমুকরা তাদের এলাকায় বৌদ্ধ ধাঁচাগুলি নির্মাণ করেছিল অর্থাৎ সেখানে বৌদ্ধ বলে কিছু ছিল না। বাংলাদেশে লালন কর নামে এক হিন্দুকে এবং তার হিন্দু ভৈরবীদের বেগম খালেদা জিয়া মুসলমান হিসাবে কবর দেয়। যদিও তাঁরা অনেক আগেই পরলোকগমন করেছিলেন এবং মৃত্যুর অনেক পরে তার আসল নাম লালন কর পালটে লালন ফকির শাহ রাখা হয়। পারস্যের পারসিক ও আরবদেশগুলির প্রাক-ইসলামিকরণের যুগের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে এবং এটাই ইসলামের দস্তুর।

সুফি ও নাক্সবন্দিরাও ইসলাম প্রচার করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ জুঙ্গার খানেত জুঙ্গারিয়াতে ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৭৫০ সালে জুঙ্গার বৌদ্ধদের উপর গণহত্যা চালায় মুসলমানেরা এবং মজার কথা তিব্বতীয় বৌদ্ধ কিং রাজবংশের অধীনে প্রায় ২ কোটি বৌদ্ধ নিহত হয়। ফলত মুসলমান আধিপত্য শুরু হয়। ১৯১২ সালে কিং রাজবংশকে হটিয়ে চীন প্রজাতন্ত্র চালু হয়। উইঘুর মুসলমানরা সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতা জোসেফ স্টালিনের সমর্থনে ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে কয়েকবার অভ্যুত্থান চালিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ১ অক্টোবর মাওয়ের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সৃষ্টির পর মাও সৈফুদ্দিন আজিজিকে পূর্ব তুর্কিস্থান প্রজাতন্ত্রের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গভর্নর নিযুক্ত করেন। উইঘুর বিচ্ছিন্নতাবাদ শুরু হয় তখন থেকে। উইঘুর নেত্রী রাবিয়া কাদের ২০০৯ সালে উরুমকি দাঙ্গা লাগায়।

বর্তমান অবস্থা :

বর্তমানে সিনজিয়াঙে উইঘুররা সর্বাত্মক পুলিশ রাজের শাসনে বাস করছে। তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের উপরে কঠোর দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে। প্রথমে অস্বীকার করলেও চীন সরকার উইঘুররা যাতে কোনো রকম ধর্মীয় চরমপন্থার আশ্রয় না নেয় তার উপর কড়া নজর রেখে চলেছে। তার মধ্যে আছে

উইঘুর সম্পর্কিত বই, দাড়ি রাখা, নমাজের জন্য কোনো বস্ত্র পরিধন করা ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ আরোপ। এমনকী লোকের বাড়িতে বাড়িতে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ উইঘুরকে গণ-আটক শিবিরে ধরে রাখা হয়েছে 'পুনর্শিক্ষা শিবির' নাম দিয়ে। সেখানে বন্দিদের রাজনৈতিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ধর্মীয় বিশ্বাস বদলানোর চেষ্টা চলছে। কয়েকজনকে সারাদিনে চব্বিশ ঘণ্টাই আটক রাখা হয় আর কয়েকজন শুধু রাতে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পায়। বন্দি

অধিবাসীরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসা করে গান গায় এবং 'আত্মসমালোচনা' মূলক প্রবন্ধ লেখে। রক্ষীদের দিয়ে বন্দিদের উপর শারীরিক ও মৌখিক অত্যাচার চালানো হয়। এমনকী তাদের পরিবারের উপরও নজরদারি চলে। পুত্র বা স্বামীদের সন্দেহজনক কাজের জন্য মহিলাদেরও আটক করা হয়।

প্রথমে পুরোপুরি অস্বীকার করলেও বেজিং এখন বলছে সন্ত্রাসবাদ দমন করতে ও উইঘুর জনগণকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিতে শিবিরগুলো খোলা হয়েছে। তথাকথিত মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বারংবার বলা সত্ত্বেও শিবির পরিদর্শনের সুযোগ দেয়নি চীন সরকার, উপরন্তু সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে অনেককে ওই শিবিরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছে। তাদের সেখানে মগজ ধোলাই করা হয়। স্ত্রী ও পুরুষদের দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন রাখার কৌশল নেওয়া হয়েছে যাতে সন্তান উৎপাদন না করতে পারে এবং দেশের জনবিন্যাসে পরিবর্তন না করতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদের এক বৈঠকে মুসলমান উইঘুর সম্প্রদায়ের গণ-আটকের তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। কিন্তু এই নিন্দাপবাদ উড়িয়ে দিয়ে চীন বলেছে এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মার্ক ক্যাসেয়ার্স চীনের কাছে দাবি জানিয়েছে তারা যেন উইঘুর ও অন্যান্য মুসলমান সংখ্যালঘুর স্বেচ্ছাচারী দমনমূলক আটক করা থেকে বিরত থাকে। প্রায় ১০ লক্ষ উইঘুরকে তথকথিত পুনর্শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক দীক্ষাদান করা হয়; এদের দিয়ে কমিউনিস্ট প্রচার ও চীনা রাষ্ট্রপ্রধান জি জিনপিয়াংকে ধন্যবাদ দেওয়া এসব করানো হয়। চীন কর্তৃপক্ষ ওয়াটারবোর্ডিং ও অন্যান্য অত্যাচার প্রক্রিয়া চালায়। ওয়টারবোর্ডিং এমন এক জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি যাতে কোনো ব্যক্তিকে একটা বোর্ডের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় উপর দিকে মুখ করে যেটা নীচের দিকে গড়াতে থাকে আর সেই সঙ্গে খুব বেশি করে নাকে মুখে জল ঢালা হয় যাতে তার অনুভূতি হয় যে সে ডুবে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে চীনের বিদেশ মন্ত্রী বলছেন— 'বিশাল সংখ্যার মানুষকে মানবাধিকার দেওয়া হচ্ছে আবার তাদের বাঁচানোও হচ্ছে'। তিনি আরও বলেছেন--- 'বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসদমনের এক নতুন পথ দেখিয়েছে চীন'। সত্য কথাই বলেছে, কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে যত হইচই হয় বিশ্বজুড়ে এক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও হয় না।

সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত উইঘুররা এশিয়-তুর্কি ভাষায় কথা বলে। তারা চীনের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং ওই অঞ্চলকে পূর্ব-তুর্কিস্তান বলে। প্রাচীন সিল্ক রুটের বাণিজ্যপথে অবস্থিত জিংজিয়াং তেল ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ চীনের অন্যান্য অংশের অগ্রগতির সঙ্গে এখানেও উন্নতি হয় এবং চীনের অন্য অংশ থেকে হান গোষ্ঠীর চীনারা সেখানে অভিগমন করে। কিন্তু এর ফলে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয় ও হানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। এতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, বিশেষত শহরাঞ্চলে। ২০০৯ সালে জিংজিয়াংয়ের রাজধানী উরুমকিতে দাঙ্গা হয়; উইঘুররা চীন সরকারের দমননীতি ও হান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিবাদে অমুসলমানদের আক্রমণ করে। প্রায় ২০০ লোক নিহত ও কয়েকশো আহত হয়েছিল সেই জাতিদাঙ্গায়। জিংজিয়াং চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য কোটি ডলারের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের কেন্দ্রভূমিতে পড়ে এবং সরবরাহের আকর। চীনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চায়। চীনের বিশ্বব্যাপী উচ্চাভিলাষের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তাকে বাধ্য করছে এই এলাকায় তার মুঠো দৃঢ় করতে। এর পরে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তারা দমনমূলক নীতি নিয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করেছে এবং বর্ধিত মাত্রায় তাদের উপরে নজরদারি চালাচ্ছে। কিন্তু উইঘুররা হিংস্র ভাবে অনেক জায়গায় আক্রমণ চালাচ্ছে। শিশুদের মুসলমান নাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। সারা ২০১৭ সাল ব্যাপী এটা চলে। ২০১৬-তে চেন কুয়ানগুও নামে এক জাঁদরেল কমিউনিস্ট নেতাকে জিংজিয়াংয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি এর আগে তিব্বতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি তি শহরে ৫০০ লোকের একটা করে বর্গাকার এলাকা চিহ্নিত করেছিলেন এবং প্রতি বর্গক্ষেত্রের জন্য একটি করে থানা গঠিত করেন সারাক্ষণ অধিবসীদের উপর নজরদারি চালানোর জন্য। অনুরূপভাবে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটা গ্রামের জন্য একটি করে থানা তৈরি করা হয়। ট্রেন স্টেশনে নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট স্থাপিত হয় যেখানে প্রত্যেকে তার আইডি কার্ড স্ক্যান করাবে। মুখের স্ক্যানও করানো হয়েছে। পুলিশ ফোন বাজেয়াপ্ত করে সকলের গতিবিধি নথিভুক্ত করেছে এবং যাতে তারা বিদেশ যেতে না পারে তার জন্য পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছে।

উইঘুররা যেমন সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে, চীন সরকার তার পাল্টা দমনের পথ অবলম্বন করেছে। ভারতের কাশ্মীর নীতিতে এর কী প্রভাব পড়ে তা দেখার বিষয়। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

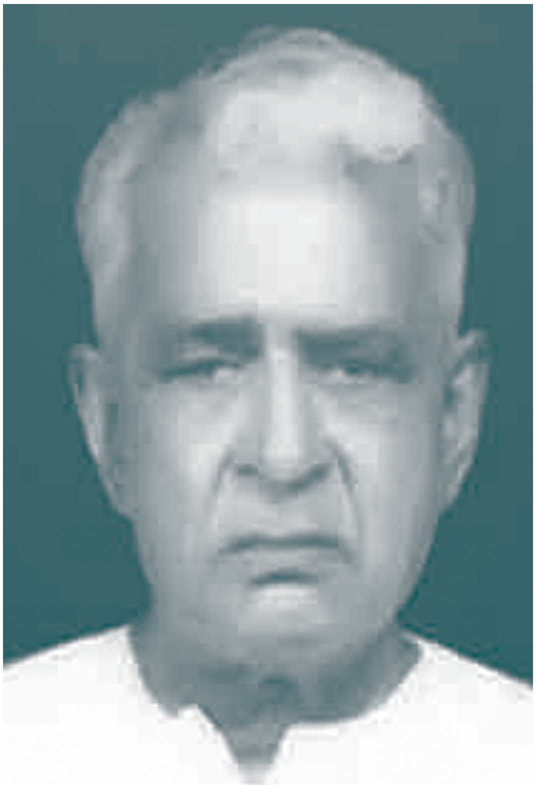

ভাষাশহিদ ধীরেনবাবুর দুঃসাহসের পুরস্কার একুশে ফেব্রুয়ারি

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

বাঙ্গালি হিসেবে, বিশেষত পুর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে আমি গর্বিত শুধু এই কারণেই যে আমার মায়ের ভাষা একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা, এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ইউনিসকো দ্বারা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতিলাভ করায়। বাঙ্গালি এবং বাংলাভাষার এই উত্তরণ সহজলব্ধ ছিল না। প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের প্রত্যক্ষ সমর্থনে, ছাত্রসমাজের দীর্ঘ আপোশহীন আন্দোলন এবং পরিশেষে সালাম, রফিক, বরকত ও জব্বারের বুকের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা যেমন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার (দ্বিতীয়) মর্যাদা পায়, তেমনি লক্ষ শহিদের রক্তের ঋণে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তান সরকার দ্বারা বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মেলে ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাই একে অপরের পরিপূরক এবং উভয়ই বাংলা ভাষা তথা বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু সেই ১৯৩৭ সালে মুসলিম লিগের লখনউ অধিবেশনে উর্দুকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের ভবিষ্যত রাষ্ট্র ভাষার পরিকল্পনার মাধ্যমে। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে প্রস্তাব করা হয় যে উর্দুই হওয়া উচিত যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম Lingua Franca, স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, সাউদ আহমেদ খানদের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় বাংলা থেকে। লেখক আব্দুল মনসুর আহমেদ উর্দুর বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে উর্দুই যদি একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয় তাহলে তো শিক্ষিত বাঙ্গালিরা চাকুরির ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে যাবেন। কিন্তু পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরে করাচিতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, উর্দুপন্থীদের হাত আরও শক্ত হলো এবং তাতে কুলোর বাতাস দিয়ে আব্দুল হাইয়ের মতো বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা জিন্নাহ্-লিয়াকতদের কাজ আরও সহজ করে দিলেন।

নবগঠিত পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গবাসীর ভাষা-সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন— (১) বৎসরে কমপক্ষে একবার ঢাকায় গণপরিষদের বৈঠক বসবে, (২) উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ধীরেনবাবুর এই প্রস্তাব অন্যান্য কংগ্রেস সদস্য যেমন, প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করলেও পূর্ববংলা থেকে নির্বাচিত অন্য কোনো মুসলমান সদস্য প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসেননি। এই ঘটনা, লিয়াকত আলি খানকে সাহস জুগিয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রবীণ সদস্যকে কটাক্ষ করতে এবং তাঁকে দুই অংশের পাকিস্তানি ভাইদের মধ্যে বিভেদের চক্রান্তকারী হিসেবে দোষারোপ করতে। জিন্নাহ্ সাহেব আরও এক ধাপ এগিয়ে ধীরেনবাবুদের কংগ্রেস দল ও হিন্দুদের পাকিস্তানের শত্রু ও ভারতের দালাল বললেন। জিন্নাহর এই মনোভাবই বুঝিয়ে দেয় যে, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার ভাষণে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিলুপ্তি ঘোষণা এবং জাতি-ধর্ম- নির্বশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও বৈষম্যহীন জাতি গঠনের সংকল্প কেবল কপটতাই ছিল। ধীরেনবাবুর এই বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালিদের প্রতি দায়বদ্ধতার দুঃসাহসের পুরস্কার স্বরূপ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অশীতিপর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর পুত্র দিলীপ দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

প্রসঙ্গত, রমনার রেস কোর্স ময়দানে এক গণ সংবর্ধনায় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জিন্নাহর ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ প্রদত্ত ভাষণের একাংশ নিম্নরূপ :

‘‘কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, আমাদের মধ্যে নানা বিদেশি এজেন্সির অর্থপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি নষ্ট করতে বদ্ধ পরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা

সাবধান হয়ে চলুন। আমি চাই আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। তারা বলছে যে, পাকিস্তান ও পূর্ববাংলা সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়— এর থেকে মিথ্যা ভাষণ আর কিছু হতে পারে না। সোজাসুজিভাবে আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশিদের সাহায্যপুষ্ট এজেন্ট আছে— এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্থ হবেন। পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেননি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য'' (বদরুদ্দিন উমরের ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি থেকে উদ্ধৃতি)। জিন্নাহর এই বক্তব্য থেকে পাকিস্তানের মূল এজেন্ডা 'হিন্দু ও ভারত বিরোধিতা' স্পষ্ট হয়ে গেল এবং এভাবেই পাকিস্তানের রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকরণের দিক নির্ণয় হয়ে যায়। কিন্তু জিন্নাহর এই উগ্র বাংলা বিরোধিতার পথ কিন্তু তার সাধের পাকিস্তান খণ্ডিত হওয়ার বীজ বপন করে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আব্দুল হাই-সহ উর্দুপন্থীদের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। তাদের মতে, 'বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্যসূত্র বিচ্ছিন্ন হবে এবং ফলে পাকিস্তানি জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এই প্রতিবেদকও মনে করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আবেগ কাজ করেছে তা অঙ্কুরিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের ভিতর থেকে।

আমি আগেই বলেছি— পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। এই লড়াইয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর আগে ও পরেও অনেক রক্ত ঝরেছে এবং বাঙ্গালিরা পাকিস্তানের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান যখন ঠিক করলো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলাকে রাখা হবে না, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালিরা গর্জে উঠলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মহম্মদ শহিদুল্লাহ দাবি করেন— ''বাংলাই হোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কারণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। আর উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়, তাই ওই ভাষাটিকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।'' যাই হোক, পরিশেষে ১৯৫৬-এ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ায় বাঙ্গালির স্বাধীন সত্তার প্রথম বিজয় অভিষেক হলো। অবশ্য উর্দুপন্থীরা এই স্বীকৃতিতে হিন্দু-বাঙ্গালি সংস্কৃতির ফাঁদে পা দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন।

প্রসঙ্গত শৈশব এবং কৈশোরে প্রতি বৎসর ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরির কথা আজও ভুলিনি। এখনো ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে মনোবীণায় অনুরণিত হয় গফর চৌধুরীর লেখা গান— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি— আমি কী ভুলতে পারি? —না ভাই— কর্মজীবনের পুরো সময়টা অতিবাহিত করে— ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও, আজও তোমাকে ভুলিনি। বাঙ্গালি জাতি সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের যে কোনো সংগ্রামে— ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলনই হোক বা ৬ দফা/ ১১ দফা দাবিই হোক, কখনো নিজেকে দূরে রাখতে পারিনি, পিছপা হইনি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাইতো, ২০১৩-তে শাহবাগের বন্ধুরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা শত্রুদের জঘন্য মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে সোচ্চার— এপার বাংলায় এই প্রতিবেদকের নেতৃত্বে 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী আন্দোলন' সংগঠনটি কলকাতার রাস্তায় নামে শাহবাগীদের সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য। ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক স্টেটস্‌ম্যানের কলামে এই লেখকের প্রতিবেদন, ''শাহবাগ আন্দোলন হচ্ছে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অসমাপ্ত অধ্যায় এবং এই আন্দোলন অসামান্য ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছে। এই যুদ্ধে যদি শাহবাগ কোণঠসা হয়, তাহলে বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় বর্বরতা নেমে আসবে, বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় যুক্ত হবে বাংলাদেশের নাম। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নয়— বিপন্ন হবে মুক্ত চিন্তার সংখ্যাগুরুরাও। তবে আমার বিশ্বাস— কেউ আজ এই উদ্বেলিত যুবশক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারেব না— এটাই পূর্ববাংলার ছাত্র ও যুব আন্দোলনের ইতিহাস। বরং আজ যারা শাহবাগীদের বিরুদ্ধে— তারাই নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।'' ২০১৯-এর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল লেখকের এই বক্তব্য প্রমাণ করে।

প্রসঙ্গত, ভাষা আন্দোলন নিয়ে কোনো আলোচনা, অসমের বারাক উপত্যকার বাঙ্গালিদের বাংলা ভাষা আন্দোলনে আত্মবলিদানের উল্লেখ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে অসম সরকারের শুধু অসমীয় ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্তে এবং ২৪ অক্টোবর বিধানসভায় আইন পাশ, বরাক উপত্যকার (শিলচর, কাছার, করিমগঞ্জ অঞ্চলের) বাঙ্গালিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১-তে বাঙ্গালিদের তৈরি গণসংগ্রাম পরিষদ, বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয় সম্প্রদায় বাঙ্গালি হিন্দুদের ওই আন্দোলন দমিয়ে দিতে, তাদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ শুরু করে ফলে ৯ জন হিন্দু বাঙ্গালি নিহত এবং শতাধিক আহত হন। এছাড়াও, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের হিন্দুগরিষ্ঠ বারাক উপত্যকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সরকার বাঙ্গালিদের এই আন্দোলন দমনের জন্য ১৮ মে, ১৯৬১-তে আন্দোলনের বিশিষ্ট ৩ নেতা নীলকান্ত দাশ, রবীন্দ্রনাথ সেন এবং বিধুভূষণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। গণসংগ্রাম পরিষদ ১৯ মে, ১৯৬১-তে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায়, সম্পূর্ণ বারাক উপত্যকা স্তব্ধ হয়ে যায়। হরতাল চলাকালীন একটি ট্রাকে করে, পুলিশ অন্য জায়গা থেকে ধৃত আন্দোলনকারীদের শিলচর স্টেশনের পাশ থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়, ওখানে অবস্থানরত আন্দোলনকারীরা পুলিশের কাছ থেকে ধৃত সঙ্গীদের ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রাকটিতে অগ্নিসংযোগ করে। তখন পুলিশের একটি দল অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে ১৭ রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে ১১ জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে। অসম সরকার চাপে পড়ে, মোট ২০টি প্রাণের বিনিময়ে, বারাক উপত্যকায় বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই বাঙ্গালি বারবার বুকের রক্তে মাতৃভাষাকে রঞ্জিত করে প্রমাণ করেছে— 'বাংলা এবং বাঙ্গালি অবিচ্ছেদ্য'।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর)

বিশেষ প্রতিবেদন

মমতা ব্যানার্জির সব চালই এখন ভেস্তে যাচ্ছে

অমিতাভ মিত্র

পৃথিবীর সব পাগলই বলে যে সে পাগল নয়। তেমনই মমতা ব্যানার্জির 'সত্যাগ্রহ' ধরনা নাটক আসলে সত্যাগ্রহ নয়, তাঁর 'রাজনৈতিক নাটক'। সবাই বোঝে, শুধু উনি বুঝেও না বোঝার ভান করেন। এই নাটক তাঁর জীবন-জীবিকা-অবলম্বনের লড়াই, এক কথায় তাঁর অস্তিত্বের লড়াই। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কোনোরকম চাওয়া-পাওয়া বা উন্নতির সম্পর্ক নেই। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ নামক ভারতের অঙ্গরাজ্যটি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সর্বদিকে পিছিয়ে পড়ার অবস্থায় আছে।

মমতা ব্যানার্জি অনেক নাটক তো বিগত তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বাংলার মানুষকে দেখালেন। ভিখারি পাসোয়ান, ধানতলার ধর্ষিতা বালিকাকে নিয়ে মহাকরণে ধরনা। ঐতিহাসিক ২১ জুলাই। নানুর, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, সারদা-নারদা, ছবি আঁকা ও নিলাম করা ইত্যাদির পর তার নবতম সংযোজন সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে 'ধর্মতলায় ধরনা'।

গত রবিবার ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিটে সিবিআইয়ের কয়েকজন অফিসার কলকাতা পুলিশ কমিশনারের লাউডন স্ট্রিটের বাংলোয় যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ সিবিআই অফিসারদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পার্কস্ট্রিট থানায় নিয়ে গিয়ে সাময়িক আটক করে, পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিরত করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স ও নিজাম প্যালেসের সিবিআই দপ্তর যথাক্রমে বিধাননগর পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ ঘিরে ফেলে। দশ-বারো মিনিটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বেনজির ভাবে পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বাড়িতে পৌঁছে যান। এবং সেখান থেকে সোজা ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে 'ধরনা' তথা তাঁর ভাষায় 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণা করেন। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু পুরনো সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা হলো এই মেট্রো চ্যানেল। ধরনামঞ্চে অভিযুক্ত পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, ডিজিপি বীরেন্দ্র, রাজ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ ইত্যাদি প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বসে পড়েন। আধঘণ্টার এই টান টান উত্তেজনাময় চিত্রনাট্য যে কোনো দক্ষিণের মশলাদার সিনেমাকে হার মানায়। সারা ভারতের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এই ঘটনা 'ব্রেকিং নিউজ' হিসাবে প্রচারিত করতে থাকে। রবিবারের ছুটির সন্ধ্যে বেলায় ভারতের রাজনৈতিক জগৎ বাজেট অধিবেশনের মতো গরম হয়ে ওঠে। ভারতের এক অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার অনুগত আই পি এস অফিসারকে সিবিআই জেরা থেকে বাঁচাতে শহরের রাজপথে ধরনায় বসেছেন। যা স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

আসলে 'স্বভাব যায় না মরলে' এই প্রবাদটি আমাদের সকলের জানা আছে। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই এইভাবে নাটক ও চমক দিতে দিতে মমতা ব্যানার্জির আজ পশ্চিমবঙ্গের টানা সাত বছরের মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁর এই ধরনের চমক দেখতে দেখতে ক্লান্ত। তিনি নিজেও আজকাল ক্লান্ত। কিন্তু তাঁরও আর এই চমক ছাড়া কিছু করার নেই, তাঁর জীবন-জীবিকা-অবলম্বন বড়ো বালাই যে! তাই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তাঁর ওই নবতম নাটক।

> **রাজ্যের মানুষ যদি ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটাতে পারে, তাহলে তৃণমূলের দশ বছরের অপশাসনের অবসান হবে না কেন! দশ বছর উল্লেখ করাটা কারণ বিজেপি আর যাই করুক, সাংবিধানিক ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করবে না। আপনি নিজে থেকেই ঝরে পড়ে যাবেন।**

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে সারদা-নারদা কেলেঙ্কারির সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ইডি ও সিবিআই খাঁড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুযোগ পেলেই মোদীজী দিদিকে আঘাত করছেন। আঘাত খেয়ে দৌড়তে দৌড়াতে দিদির আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে গেছে। কয়েকমাস বাদে আগামী লোকসভা নির্বাচনে যদি নরেন্দ্র মোদী আবার দিল্লির ক্ষমতয় আসেন তাহলে আর তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। তখন কোলের শিশু ভাইপো-সহ দলবল নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিতে হবে। এই আশঙ্কা বেশ কয়েকমাস আগেই আঁচ করতে পেরেছেন। তাই নিজে বাঁচার জন্য গত বছর ধর্মতলায় তৃণমূলের ঐতিহাসিক ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এ বছরের উনিশে জানুয়ারির বিগ্রেড সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন। যেখানে তাঁর মতো দুর্নীতিগ্রস্থ, ইডি, সিবিআই দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত নেতাদের নিয়ে একটা জোট-ঘোঁট তৈরি করেন, যাতে মোদীজীকে দিল্লির সরকার গড়া থেকে আটকানো যায়।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হাজারও চেষ্টা করে মহাশক্তিশালী নরেন্দ্র মোদীজীকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত করা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিককালের সব 'এগজিট পোলের' সমীক্ষায় তা উঠে এসেছে। গত উনিশের বিগ্রেডে রাজ্যের মেহনতি গরিব মানুষকে ধমকে দমকে হাজির করিয়ে, ভারতের তেইশটি দলের নেতাদের কাছে মমতা ব্যানার্জি নিজেকে ঝাঁসির রানি প্রমাণ করার পরও স্নায়ুর উপর চাপ কমছে না, তার উপর আবার সিবিআই কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে সারদা-রোজভ্যালি তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছে। যে কিনা তার বিশেষ অনুগত, দায়িত্বের সঙ্গে সারদা-রোজভ্যালি কাণ্ডে বিক্ষোভ তদন্ত সংস্থার 'এস অই টি' হয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণাদি নষ্ট

করেছে। এহেন পুলিশ কর্তা যদি ভুল করেও একটা ক্লু সিবিআইকে দিয়ে দেয়, তাহলে নরেন্দ্র মোদী যে তাঁর হার্টঅ্যাটাক করিয়ে ছাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং ডু অর ডাই অবস্থায় পড়ে আবার ধরনার নাটক শুরু করা ছাড়া কোনো রাস্তাই ছিল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। যদি এই নাটকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষের হৃদয়ে একটু দয়ার সৃষ্টি করা যায়। যেটা তাঁকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে সাহায্য করবে। বিপদে দিশাহীন হয়ে ধরনামঞ্চে দলের নেতাকর্মী থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের বসিয়ে একটা 'খিচুড়িমঞ্চ' তৈরি করে ফেললেন যা একেবারে অসাংবিধানিক, তার উপর আবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর গালে সপাটে চড় মারলেন। সিবিআই তার এক্তিয়ারের মধ্যেই কাজ করছে। সিবিআইকে বাধা দেওয়া যাবে না। রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিতে হবে এবং সিবিআই যখন চাইবে তখনই হাজির হতে হবে। সুপ্রিমকোর্ট জেরার স্থানও নির্দিষ্ট করে দিল। পাহাড়ের কোলে মনোরম শহর শিলংয়ে, সেখানকার মনোরম ঠাণ্ডা আর হাওয়ায় রাজীব কুমার ও সিবিআই অফিসারদের মাথা ঠাণ্ডা থাকবে। কিন্তু কলকাতায় মমতা ব্যানার্জির মাথা গরম ও বিচলিত থাকবে। আর এইসব দেখে সবথেকে আনন্দ পাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আজ অবধি শুধু চালাকি আর বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা। চালাকি করতে করতে আজকাল তাঁর সব দানই ভেস্তে যাচ্ছে। সব দানেই হিতে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর নবতম সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ধরনা চালটিও হিতে বিপরীত হয়ে গেল। তিনি ভেবেছিলেন যে এই ধরনা নাটকে বুঝি উনিশের বিগ্রেডের তেইশটি দলের নেতরা তো সশরীরে আসবেন। সেই সঙ্গে এন ডি এ-তে নেই সেই সকল দলের নেতারাও আসবেন। যেমন টি আর এসের চন্দ্রশেখর, বিজেপির নবীন পট্টনায়ক, এ আই ডি এম কে ইত্যাদি। টি আর এস, বিজেডি দূরের কথা, তেইশটি দলের বেশিভাগ নেতাই এই নাটকে কোনো সাড়াই দেয়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী একটা টুইট করে ছেড়ে দিয়েছেন। এসেছিলেন দুর্নীতির দায়ে জেলবন্দি লালুপুত্র তেজস্বী যাদব ও টুজি কেলেঙ্কারিতে জেলখাটা কানিমোঝি। তাছাড়া সুপ্রিমকোর্টের 'অ্যাপেক্স বেঞ্চের' চড় খাওয়ার পর তাঁর পাশে অতি মূর্খও দাঁড়াবে না, তা তিনি ভালো করে জানতেন। তাই তড়িঘড়ি চন্দ্রবাবু নাইডু মঞ্চে থাকতেই ধরনা বাতিল করেন।

আর বিশ্বাসঘাতকতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। তাঁর দলের এক সিনিয়ার মোস্ট নেতার ভাষায়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পলের জন্য বিশ্বাস করে না কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা। তিনি নিজে কীভাবে বিজেপি ও কংগ্রেসকে ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ নিজের এই অবস্থায় পৌঁছেছেন, তা আমাদের সকলেরই কম বেশি জানা।

আসলে মমতা ব্যানার্জি আজ ভয়ার্ত, রাতে ঘুমোতে পারেন না। মোদী-অমিত শাহ সর্বোপরি বিজেপি নামক ভাইরাসে আক্রান্ত। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেন যে বিজয় মাল্যের জন্য যদি পুনার আর্থার রোড জেলে ঝাড়পোঁছ শুরু হয়ে থাকে। তাঁর জন্যও দমদম বা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ঝাড়পোঁছ শুরু হওয়া উচিত! কোলের শিশু ভাইপোকে নিয়ে থাকবেন। একটু মানানসই ব্যবস্থা না হলে, পুত্রসম আদরের 'বাবুসোনার' যে বড়ো কষ্ট হবে!

এই কারণে ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স এবং নিজাম প্যালেসের সিবিআই অফিস পুলিশ দিয়ে ঘেরার সঙ্গে সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর হরিশ চ্যাটার্জি রোডের প্রাসাদসম বাসভবনও কলকাতা পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন। বাসভবনের প্রতিবেশীদেরও পুলিশি জেরা ও তল্লাসির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে হয়েছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে মোদী ভাইরাস তাঁর মস্তিষ্কে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

এনাফ ইজ এনাফ দিদি, সাংবিধানিক সংকট নরেন্দ্র মোদী তৈরি করেননি, করেছেন আপনি। ১৬৭ বছরের ঐতিহ্যশালী কলকাতা পুলিশ দিয়ে সিবিআইকে বাধা দিয়ে এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আপনার নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য দলীয় রাজনৈতিক মঞ্চে বসিয়ে, রাজ্যের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক পদাধিকারীদের ধরনার পাশে বসিয়ে সারা ভারতের মিডিয়ায় ফটোমেশন করিয়েছেন। তাদের সাংবিধানিক মর্যাদা আপনি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। লালুপ্রসাদ যাদব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও পরে ভারতের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তার কাজকর্ম ও কথাবার্তা যেমন আপামর ভারতীয়দের হাসির খোরাক হতো, আপনিও তেমনি আপনার কাজকর্ম ও কথাবার্তা দ্বারা সারা ভারতীয়দের কাছে নিজেকে হাসির খোরাকে পরিণত করেছেন। যার মাধ্যমে আমাদের বাংলা তথা বাঙ্গালির ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করছেন। রাজ্যের মানুষ যদি ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটাতে পারে, তাহলে আপনার দশ বছরের অপশাসনের অবসান হবে না কেন! দশ বছর উল্লেখ করাটা কারণ বিজেপি আর যাই করুক, সাংবিধানিক ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করবে না। আপনি নিজে থেকেই ঝরে পড়ে যাবেন। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

চিঠিপত্র

জাতীয় পতাকার অবমাননা নয়

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশবাসীকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে যে প্লাস্টিকের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা হচ্ছে, তা বন্ধ করতে হবে। কারণ দেখানো হয়েছে প্লাস্টিক কাগজের মতো পচনশীল নয়। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পতাকা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খুবই সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কেননা জাতীয় পতাকা দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। জাতীয় পতাকার প্রতি দেশের মানুষের সর্বজনীন অনুরাগ ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো অনুষ্ঠানের পর প্লাস্টিক বা কাগজের ছোটো ছোটো পতাকা যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। তা সত্যিকারের দেশপ্রেমী মানুষের কাছে বড়োই বেদনাদায়ক। খুবই আনন্দের বিষয়, মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আবার দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ২০০২ সালের ভারতের জাতীয় পতাকা বিধি অনুসারে কোনো অনুষ্ঠানের শেষে কাগজের জাতীয় পতাকা মর্যাদার সঙ্গে গোপন স্থানে বিনষ্ট করতে হবে।

—**শুভম ঘোষ,**
তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬।

ফার্নান্ডেজ জেলে বসে সহ- বন্দিদের গীতা শোনাতেন

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজবাদী ঘরানার জাতীয়তাবাদী নেতা' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রয়াত জর্জ ফার্নান্ডেজের ওপর আলোকপাত খুবই সময়োচিত। লেখককে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

ভারতের জাতীয় রাজনীতির মহারথীদের মধ্যে একজন ছিলেন জর্জ ফার্নান্ডেজ। তিনি কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে গোঁড়া খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা চেয়েছিলেন তিনি বড়ো হয়ে পাদরি হয়ে খ্রিস্টধর্মের কাজ করুন। সেজন্য তিনি তাকে মিশনারি স্কুলে ভর্তিও করেন। কিন্তু ২ বছর পরে মোহভঙ্গ হওয়ায় তিনি রোজগারের তাগিদে মুম্বই পাড়ি দেন। সেখানে সোশ্যালিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ানের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ানের নেতা হয়ে যান সহজেই। জরুরি অবস্থায় তিনি খুশবন্ত সিংহ নাম নিয়ে দাড়ি রেখে পাগড়ি পরে শিখ সেজে ঘুরে বেড়ালেও কলকাতা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লির তিহার জেলে বসে তিনি গীতা পড়ে সহ-বন্দিদের শুনাতেন। ২০০২ সালে যখন গোধরা কাণ্ড হয় তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ নিয়ে বলেন— ইনিই ভবিষ্যতে ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আলোকপাত করবেন। পরবর্তীতে এনডিএ সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন কার্গিল যুদ্ধ ও পোখরানের নিউক্লিয়ার টেস্ট হয়। সত্যিই তিনি উচ্চস্তরের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

—**মণিরাম মণ্ডল,**
মঙ্গলবাড়ি, মালদহ।

দিদির ধরনার নাটক

সারদাকাণ্ডে যখন মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে তখন ধরনায় বসেননি দিদি। নিজের দলীয় সাংসদ-বিধায়কদের যখন গ্রেপ্তার করা হলো তখনও তিনি পথে নামেননি, ধরনায় বসেননি। আজ হঠাৎ সারদাকাণ্ডে রাজীব কুমারকে সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে বাঁচাতে ধরনায় বসলেন তিনি। কিন্তু তাও শেষরক্ষা করতে পারেননি। সুপ্রিম কোর্টের ঘাড়ধাক্কায় রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের জেরার মুখে বসতেই হবে। শোনা যায়, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নাকি বনধ্ বিরোধী? তাহলে রাজীব কুমারকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর ভাইয়েরা যে বাস, ট্রেন, রাস্তা অবরোধ করলো তাতে কি জনজীবন সচল ছিল? দিদি কী ভেবে দেখেছেন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোর কী অবস্থা, যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, যাদের একদিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে পরেরদিন উনুন জ্বলে না। আপনার অনুপ্ররণায় কাজ বন্ধ হয়ে গেলে সেই মানুষগুলোকে কি আপনি সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ করবেন? না আপনার রাজ্যের বিখ্যাত শিল্প বোমা অথবা চপ শিল্প গড়ে দেবেন?

—**সুমন সরকার,**
ধুলাগড়ী, হাওড়া।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। সবে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, চারিদিকে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। কখন যে কী হয় সকলের মনে এই ভাবনা। মালদহ জেলার যে অংশে আমরা বসবাস করছি সেই অংশটি তখন তিনদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালদহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তখন মুরলীধর নায়েক। তখন একদিন হঠাৎ শোনা গেল মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ কয়ার নেতৃত্বে বিশাল রাজাকার বাহিনী মালদহ শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। শহরের নাগরিকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ডি.এম.-এর শরণাপন্ন হয়। ডি.এম. জানান যে তাঁর কাছে যে পুলিশ বাহিনী আছে তা দিয়ে কেবল সরকারি কোষাগার রক্ষা করা সম্ভব। অন্য উপায় না পেয়ে শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা তখন মুরলীধর নায়েকের শরণাপন্ন হন। তিনি তখন শহরের বেশ কিছু স্বয়ংসেবককে পুর্ণ গণবেশে সজ্জিত করলেন। প্রত্যেকের বাহন সাইকেল। প্রত্যেকের কোমরে তলোয়ার। এসবের কিছু আসল এবং কিছু নকল। আর প্রত্যেকের সাইকেলে পেট্রল ভরা জারিকেন। এইগুলিও ছিল আসল-নকল মিলিয়ে। এইভাবে সজ্জিত হয়ে তারা দলবদ্ধ ভাবে শহরের ছোটো ছোটো রাস্তায় ঘন ঘন পরিক্রমা করতে লাগল। এদিকে সারা শহরে মুখে মুখে প্রচার করা হলো যে মুরলীজী

গোঁসাই বাগানে অর্থাৎ তৎকালীন মালদহ জেলা কার্যবাহ শুভ নারায়ণ গিরির বাগানে ড্যাগার ব্রিগেড মজুত রেখেছেন। নির্দিষ্ট দিনে মহম্মদ কয়ার নেতৃত্বে মুসলিম লিগের বিশাল রাজাকার বাহিনী শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। এদিকে নায়েকজী পূর্ণগণবেশে সজ্জিত হয়ে কোমরে তলোয়ার গুঁজে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললেন রাজাকার বাহিনীর দিকে। কয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে হাঁকলেন 'হল্ট।' হঠাৎ এই বজ্রকণ্ঠ শুনে কয়ার বাহিনী হতচকিত হয়ে পড়ল। তারা ভয়ে ভয়ে জানালো যে দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে শোভাযাত্রা বের করেছে। নায়েকজী তখন জানালেন যে, 'তাহলে তোমরা আমার পিছনে পিছনে পথে নগর পরিক্রমা করে চলে যাও, তা না হলে আমি ড্যাগার ব্রিগেড ডাকব।' অগত্যা বিশাল রাজাকার বাহিনী নায়েকজীর নেতৃত্বে মালদহ শহর পরিক্রমা করে চলে গেল। শহর বিশাল বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল। শহরবাসী নায়েকজীর সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগল। আজও মালদহের প্রবীণরা একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

—**মোহিতলাল গোস্বামী,**
কলিগ্রাম, চাঁচোল, মালদহ।

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা পশ্চিমবঙ্গে নয় কেন?

সম্পতি কেন্দ্র সরকার একটি জাতীয় সুরক্ষা প্রকল্প করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫০ কোটি দরিদ্র ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারকে হাসপাতালে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কভারেজ সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পটি সারা দেশে চালু করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত যোজনা পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে দেবেন না। তিনি বলেছেন তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পের সঙ্গে নেই। তৃণমূলের নেতারা পোস্ট অফিসে গিয়ে সেই আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলছে। তিনি বলেন রাজ্যসরকার এই প্রকল্পে অর্থ জোগাতে অনিচ্ছুক। মুখ্যমন্ত্রীর দলের কর্মীরা বিভিন্ন রকম ভাবে রাজ্যবাসীকে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে দিচ্ছে না। কারণ তারা জানে যে রাজ্যবাসী যদি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কথা ভুলে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের বা প্রধানমন্ত্রীর গুণগান করবে। এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভুল সিদ্ধান্তগুলি ধরা পড়ে যাবে।

তাই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসমর্থকরা রাজ্যের বিভিন্ন পোস্টঅফিস ভাঙচুর করে এবং পোস্টঅফিস কর্মীদের মারধর করে প্রধানমন্ত্রীর এই গরিব এবং দুর্বল মানুষদের জন্য এই প্রকল্পকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা করছে। রাজাবাসীকে এর প্রতিবাদে গর্জে উঠতে হবে।

—**শুভময় দেব,**
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আদালতে গড়াল দেশবিরোধিতার অভিযোগ

২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটা 'কালোদিন'। কারণ ওইদিনে সংসদ হামলার অন্যতম কুখ্যাত 'মাস্টারমাইন্ড' দেশদ্রোহী আফজল গুরুর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয়েছিল এক স্মরণ সভা। আয়োজক ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শেহলা রশিদ, আকিব, মুজিব, মুনিব, উমরগুল, বশির, সিপিআই নেতা ডি রাজার মেয়ে অপরাজিতা। এরা সবাই বাম-সেকুলারমার্গী। কেউ প্রাক্তন, কেউ বর্তমান ছাত্র বা ছাত্রী। এরা পাকপন্থী, সন্ত্রাসবাদী ও স্বাধীন কাশ্মীরের প্রবক্তা ও ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রীদের অন্যতম ষড়যন্ত্রী আফজল গুরুর চেলা বা সমর্থক। আর এরাই সেই স্মরণানুষ্ঠানে তুলেছিল দেশবিরোধী স্লোগান— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লা, ইনশাল্লা।' উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বিচারে আফজলগুরুর ফাঁসি হয়েছে দেশদ্রোহিতার অপরাধে। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশ ওই বিতর্কিত সভার আয়োজন ও দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়ার অপরাধে কানহাইয়া, অনির্বাণ ও উমর-সহ ৯ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করেছে 'চার্জশিট'। তাই আইনের পথেই চলবে এদের বিচার। তবে দেশদ্রোহিতা ছাড়াও এদের বিরুদ্ধে নানা অপরাধমূলক ধারা আনা হয়েছে। আমরা, যারা দেশকে ভালোবাসি, বিচারের অপেক্ষায় থাকলাম।

সত্যি বলতে কী, দীর্ঘদিন ধরেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়টি বিতর্কের শিরোনামে। জে এন ইউ এদেশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষের কাছে বাম-রাজনীতির আখড়া হিসেবে পরিচিত। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সম্প্রতি যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। যদিও অভিযুক্ত ছাত্রনেতা- নেত্রীদের বক্তব্য, ওই অনুষ্ঠানে কোনো দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়নি। তবে ফরেনসিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, অনুষ্ঠানের সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইল সত্যি। অভিযুক্তদের আচরণ জাল নয়। অতঃপর জে এন ইউ-র উগ্রবামমার্গী শিক্ষার্থীরা বাম রাজনীতিতে যে ইদানীং দেশদ্রোহিতাকেও আমদানি করেছে সেকথা বলাটা অত্যুক্তি হবে কী? আর যাদের কাছে দেশপ্রেমের চেয়ে বাম রাজনীতির নামে দেশবিরোধিতা বড়ো, তাদের দেশদ্রোহী ভিন্ন তাদের আর কোন অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

দুই লেখিকার কলমে চার নায়িকা

রূপশ্রী দত্ত

আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম রক্ষণশীল পরিবারে হওয়ায় প্রথাগত শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়নি। তা সত্ত্বেও স্বীয় প্রতিভাবলে উপন্যাস, ছোটোগল্প, শিশুসাহিত্যে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। অগ্নিপরীক্ষা, শশিবাবুর সংসার, নবজন্ম ইত্যাদি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়ে সুপারহিট হয়েছিল। তাঁর 'দোলনা' ও 'সেই রাত্রি এই দিন'ও দুটি বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি জ্ঞানপীঠ, দেশিকোত্তম, সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।

'দোলনা' উপন্যাসের নারীচরিত্র সুমনা একান্নবর্তী সংসারের সদস্যা। তার নেশা ছিল রাস্তায় পশুপাখির শাবক দেখলে কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করা। একদা সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শিমূলতলা যায়। সেখানে একদিন, একা বেড়াতে গিয়ে রাস্তা থেকে এক মানবশিশুকে নিয়ে আসে। বাবা-মা স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি জানালেন। কিন্তু মেয়ে অনমনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের মেনে নিতে হলো। একান্নবর্তী পরিবারেও সেই নিয়ে প্রচ্ছন্ন কটূক্তি ছিল। প্রণয়ী সিদ্ধার্থের বাড়ি থেকেও শিশুসমেত পুত্রবধূ গ্রহণে আপত্তি ছিল। সিদ্ধার্থ রসিকতাছলে সুমনাকে 'ম্যাডোনা' বললেও বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সুমনার এই মনোভাব তার পছন্দ ছিল না।

অবশেষে সিদ্ধার্থ এক কৌশলের আশ্রয় নেয়। যাতে তাদের বিবাহে কোনও আপত্তি কারো না থাকে। সে বলল, সেই ওই শিশুটির পিতা। এরপর তাদের বিবাহে বাধা রইল না। সে সুমনাকে বলল, সুমনার সঙ্গে গিয়ে শিশুটির পিতা হিসাবে সে শিশুটির জন্য একটি দোলনা কিনবে। এইভাবে মিষ্টি মধুর এক বাৎসল্য রসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সুমনার মধ্যে নারীর সহজাত মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা পুরোমাত্রায় ছিল। সেবাপরায়ণতাও তার চরিত্রে মাধুর্য

এনেছিল। তাই অনাথ শিশু— সে পশুপক্ষীরই হোক বা মানুষেরই হোক, তার কাছে সহানুভূতির পাত্র। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাই সে সেই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে ত্যাগ করতে পারে না।

আশাপূর্ণার দ্বিতীয় নারী চরিত্র 'সেই রাত্রি এই দিন'-এর বিভা। বিভার অকালবৈধব্য ঘটেছিল। তার পিতা, যৌবনে সাহেবিয়ানার ভক্ত ছিলেন। পরিণতবয়সে তিনি সংস্কৃতভাষা ও উপনিষদচর্চায় মন দিয়েছিলেন। বিভার ছিল একনিষ্ঠ পিতৃভক্তি। পিতার সেবায় সে সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত ছিল। পিতার রক্ষণশীল মনোভাবে তার সমর্থন ছিল, আবার বিধবা ভ্রাতৃবধূর অনৈতিক জীবনযাপনও তাকে মানতে হয়েছিল। এই নিঃসন্তান নারীর পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি নিখাদ স্নেহ তার মাতৃসত্তাকে প্রস্ফুটিত করে।

দ্বিতীয় লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারি ১৯২৬— ২৮ জুলাই, ২০১৬)। মহাশ্বেতা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের স্বনামধন্যা লেখিকা। সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পুরোধা। লোধা শবর প্রভৃতি জনজাতিদের স্বার্থে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর পিতা মণীশ ঘটক বিখ্যাত সাহিত্যিক। ছদ্মনাম 'যুবনাশ্ব'। ইনি বিখ্যাত চিত্র- পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ভাই।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের নারী চরিত্র সুজাতা। সুজাতা স্বামী ও পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার করে। কনিষ্ঠ সন্তান পুত্র 'ব্রতী' ছাড়া সুজাতা কারো সঙ্গেই মানসিক সাদৃশ্য অনুভব করে না। সেই ব্রতী সত্তরের দশকে— মুক্তির দশকে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দলে যোগ দিয়েছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহী তরুণরা পরিসংখ্যানমাত্র হয়ে গিয়েছিল। ব্রতীর আগে ১০৮৩ জন তরুণ গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। সে হিসেবে ব্রতী ১০৮৪তম শহিদ। কারাবরণ করে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। স্বামী বা অন্য সন্তানদের সঙ্গে ব্রতীর মৃত্যুশোক সে ভাগ করে নিতে পারত না। কারণ, তাদের মানসিকতা স্বতন্ত্র ছিল। প্রয়াত ব্রতীর মাতৃভক্তি আনুগত্য সুজাতার মনে এক নিরুদ্ধ বেদনা হয়ে, শেষে তাকে অন্তিম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় নারীচরিত্র মহাশ্বেতার 'রুদালী' উপন্যাসের শনিচরী'। 'রুদালী' কথাটির অর্থ পেশাদার রোদনশীলা নারী। বিহার অঞ্চলে ধনী ব্যক্তির মৃত্যুর পর এদের ডাকা হয় অর্থের বিনিময়ে কান্নার জন্য। শনিচরী তার শাশুড়ী, স্বামী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ও কাজের চাপে ঘটনাচক্রে অশ্রুবিসর্জন করতে পারেনি। সেই অদ্ভুত, বিচিত্র তাৎপর্যে ক্রন্দনকেন্দ্রিক পেশাতেই যুক্ত হলো। শোকগাথা ও মর্মস্পর্শী ভাবে পরিবেশিত গান, নানাভাবে সেই পরিবারকে আপ্লুত করত এবং শনিচরী পুরস্কৃত হত। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

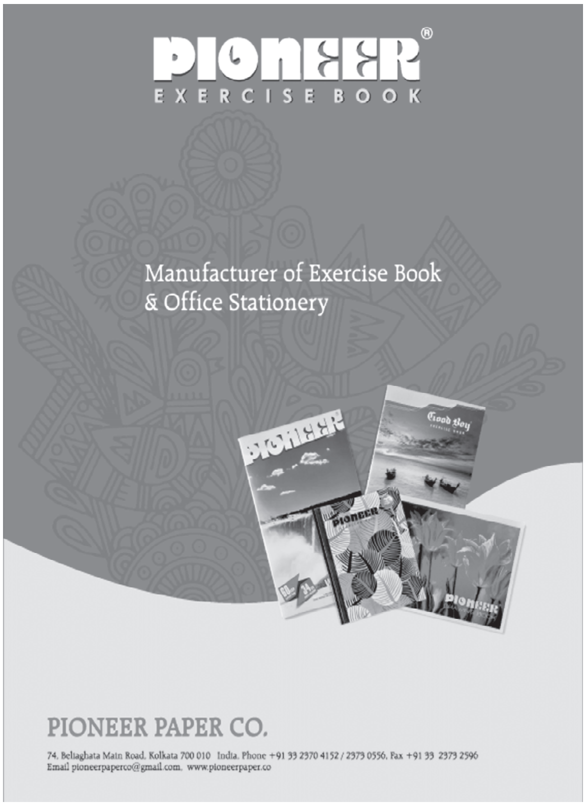

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

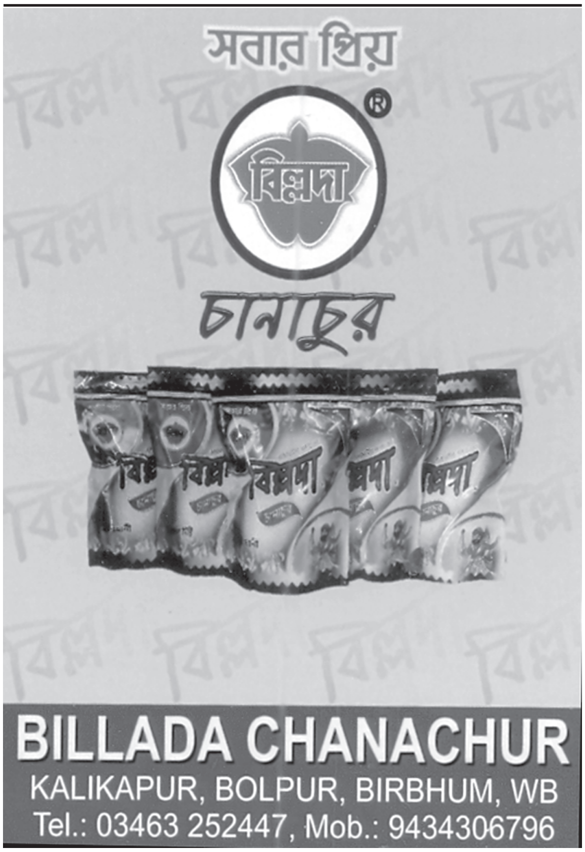

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শিলংয়েই কি লেখা হবে শেষের কবিতা?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাজীব কুমার কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন তাঁর 'নৈতিক জয়' হয়েছে। কেন নৈতিক জয় হয়েছে? কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সুপ্রিম কোর্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দিয়েছে। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বশংবদ সংবাদমাধ্যমগুলিও কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় জ্বলজ্বলে হেডিংয়ে জানিয়েছে— সিপি-কে ধরতে সুপ্রিম কোর্টের মানা। মিথ্যা জিনিসটি অতীব ভয়ংকর। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর হলো অর্ধসত্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্তাবক মিডিয়াবৃন্দ যে প্রচার করতে বাজারে নেমেছে, অর্থাৎ পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে সুপ্রিম কোর্ট গ্রেপ্তার করতে মানা করেছে, তা এককথায় অর্ধসত্য। ওই কথাটুকু বলার ভিতর দিয়ে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মূল নির্যাসটুকু লুকিয়ে রেখে একটি অর্ধসত্যকে প্রতিষ্ঠা করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। তাহলে সত্যটি কী? সত্যটি জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, সিবিআই আসলে কী চেয়েছিল। সারদা চিটফান্ড কোম্পানির মালিক সুদীপ্ত সেন ধরা পড়ার পর রাজ্য সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই তদন্তভার সিটের হাত থেকে সিবিআইয়ের হাতে যায়। সিবিআই এই ঘটনার তদন্তে নেমে বিভিন্ন অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের জেরা করে জানতে পারে, সারদার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে সিট যেসব নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল, তার অনেকগুলি সিবিআইকে হস্তান্তরিত করা হয়নি। সেই সময় সিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এই রাজীব কুমার। সিবিআই বারবার সেই নথিগুলি চেয়ে দরবার করলেও বারেবারেই তাদের বিফল মনোরথ হতে হয়। এর পরই তারা রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মনস্থির করে। সিবিআই অফিসে হাজির হওয়ার জন্য বারবার রাজীব কুমারকে চিঠি পাঠানো হয়। কোনোবারই রাজীব কুমার হাজিরা দেননি। শেষ পর্যন্ত গত ৩ ফেব্রুয়ারি লাউডন স্ট্রিটে পুলিশ কমিশনারের সরকারি বাসভবনে সিবিআই আধিকারিকরা পৌঁছে যান তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। এরপরই নাটক শুরু হয়। যা শেষ হয় ধরনামঞ্চে। সেই নাটকের বিস্তারিত বিবরণে আর যাচ্ছি না। কারণ, সেই তৃতীয় শ্রেণীর নাটকটি সবাই সবিস্তারে জেনে গিয়েছেন।

কলকাতা পুলিশের হাতে হেনস্থা হওয়ার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ সিবিআই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কারণ, চিটফান্ড কাণ্ডে তদন্তটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। সুপ্রিম কোর্টের সামনে সিবিআই জানায়, বারংবার বলা সত্ত্বেও রাজীব কুমার তাদের সামনে হাজিরা দিচ্ছেন না। তারা সন্দেহ করছেন, তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হতে পারে। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট যেন রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। ৩ ফেব্রুয়ারি লাউডন স্ট্রিটে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সিবিআই অফিসাররা হাজির হয়েছিলেন, তখনও একবারও তারা বলেননি পুলিশ কমিশনারকে তারা গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বরং, তখনও তারা বলেছিলেন, কমিশনারকে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদই করতে এসেছেন। সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা আর্জিতেও সিবিআই পুলিশ কমিশনারকে গ্রেপ্তারির অনুমতি চায়নি। সুপ্রিম কোর্ট যদিও তার রায়ের একটি অংশে বলেছে, পুলিশ কমিশনারকে এখনই গ্রেপ্তার করা যাবে না, তবুও যা আদপেই চায়নি সিবিআই তাকে ফলাও করে প্রচার করে 'নৈতিক জয়ের' কথা বলা হচ্ছে কেন? কোনো ব্যাখ্যাতেই যে তার হিসাব মিলছে না।

আসলে এই কারণেই নৈতিক জয়ের কথাটি বলতে হচ্ছে যে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পুরোটি বললে চড় খেয়ে ফিরে আসার লজ্জাটি আড়াল করা যাবে না। চড় খেয়ে চড় হজম করে হাসিমুখে ছবি তোলার আদিখ্যেতারই অপর নাম 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিক জয়।' সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই আবেদন করেছিল, পুলিশ কমিশনারকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। তাদের এই আর্জি সুপ্রিম কোর্ট মঞ্জুর করুক। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই আরও বলেছিল, তাদের আশঙ্কা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে পরিষ্কার জানিয়েছে, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সিবিআইয়ের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কমিশনারকে হাজির হতে হবে। অর্থাৎ পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার কোনোমতেই সিবিআইয়ের জেরা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। রাজীব কুমার এই জিজ্ঞাসাবাদটি এড়ানোর জন্যই এতদিন টালবাহানা

রাজীবকুমার ও অন্য পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ধরনায় মমতা।

করে এসেছিলেন। সিবিআইয়ের চিঠিতে কর্ণপাত করেননি। এই জেরার মুখে যাতে রাজীব কুমারকে পড়তে না হয়, তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সিবিআই আধিকারিকদের মারধর করে পার্কস্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিজাম প্যালেস এবং সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল। এই জিজ্ঞাসাবাদকে বাধা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী সপার্ষদ ওই রাতে পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ আটকাতেই ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করে তিনদিন ধর্মতলায় ধরনার নাটক করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ আটকাতে পারলেন কি? যে সিবিআই আধিকারিকদের লাঞ্ছনা করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ, সেই সিবিআই আধিকারিকদের সামনেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে হবে রাজীব কুমারকে। এর পরেও বলতে হবে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 'নৈতিক জয়' হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর?

আর একটি আর্জিও সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানিয়ে দিল সিবিআই। তারা সুপ্রিম কোর্টকে বলেছিল, কলকাতা নয়, অন্য কোনো রাজ্যে তারা পুলিশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। কলকাতায় করতে না চাওয়ার পিছনে সিবিআইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে। প্রথমত, পুলিশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসে যে রকম নজির বিহীন আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে সিবিআই আধিকারিকদের, তাতে তাঁরা বুঝেছেন, ভবিষ্যতে পুলিশ কমিশনারকে কলকাতায় জেরা করতে গেলেও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সেক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তদুপরি, ইতিপূর্বে চিটফান্ড কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের গ্রেপ্তার করায় আদালত চত্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা যে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তা স্মরণে আছে সিবিআই আধিকারিকদের। ফলে তারা কলকাতায় পুলিশ কমিশনারকে জেরা করতে চাইছেন না। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের এই আবেদন মঞ্জুর করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানিয়েছে, মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে হাজিরা দিতে হবে পুলিশ কমিশনারকে। পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারও এখন বুঝছেন, জালে তিনি পড়েছেন। ধরনা মঞ্চে অংশ নিয়েও তার এখন রেহাই নেই। ফলে বাধ্য ছেলের মতো তিনি এখন সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিচ্ছেন। এরপরেও যদি মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'নৈতিক জয়', তাহলে ময়দানে ঘাস খাওয়া থামিয়ে ঘোড়ারাও হাসবে।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পারিষদরা কোনোদিনই সাংবিধানিক রীতিনীতি বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে শ্রদ্ধা করেন না, মান্যও করেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বে আসীন হওয়ার ছ' মাসের মাথায় সঙ্গীসাথী-সহ ভবানীপুর থানায় চলে গিয়েছিলেন পুলিশের হাতে আটক দুষ্কৃতীদের ছাড়িয়ে আনতে। সমগ্র দেশে তিনিই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি রাজ্যের সরকারি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন— কেন্দ্র সরকারের কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে, কেন্দ্র সরকারকে কোনো রকম তথ্য না জানাতে। সমগ্র দেশে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি তাঁর নিজের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সব প্রকল্প রূপায়ণে বাধা দিচ্ছেন। ভিন রাজ্য থেকে আসা মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতাদের সভা বন্ধ করে দেওয়ার মতো অসৌজন্যতাও দেখাচ্ছেন। সাংবিধানিক রীতিনীতিকে যে তিনি এবং তার পারিষদরা একেবারেই মান্যতা দেন না, তা এবার আরও একবার প্রমাণ হলো তার ধরনার নাটকে। মুখ্যমন্ত্রী একজন আদ্যন্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ধরনায় বসলে তা নিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু তার সঙ্গে কারা ধরনামঞ্চে উপস্থিত হলেন? উপস্থিত হলেন সেই কলকাতায় পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, যাকে কেন্দ্র করে এত নাটক। হাজির হলেন রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ করপুরকায়স্থ এবং কলকাতা পুলিশের আর এক আধিকারিক অনুজ শর্মা। এরা তিনজনই আইপিএস অফিসার হিসাবে কোনোরকম রাজনৈতিক ধরনায় অংশ নিতে পারেন না। তদুপরি আই পি এস অফিসার হিসাবে এরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। স্বাভাবিকভাবে এখন প্রশ্ন উঠবেই, রাজীব কুমার কেন এত ভীত হয়ে পড়েছেন যে, তাকে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পাশে ধরনায় বসতে হচ্ছে? তাহলে কি সারদা কেলেঙ্কারির যাবতীয় রহস্য গোপন রয়েছে লাউডন স্ট্রিটের বাড়ির ভিতরই? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অবশ্য এজন্য কারণ দর্শানোর চিঠি ধরিয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টার বিরুদ্ধেও সরকারি কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। হাওয়া যে খুব একটা অনুকূল নয়, তা বুঝে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ইতিমধ্যেই গাওনা গাইতে শুরু করেছেন। বলেছেন, আমার নিরাপত্তার জন্যই রাজীব কুমার ওখানে হাজির ছিলেন। গত সত্তর বছরে আজ পর্যন্ত কখনও শোনা যায়নি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে স্বয়ং পুলিশ কমিশনার রাজনৈতিক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর পাশের চেয়ারখানি আলো করে বসেছেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা আছেন। এরপর তো সভা-সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভাষণ দিয়ে এসে রাজীব কুমার বলবেন, আসলে নিরাপত্তায় খাতিরেই তিনি এমন কাজটি করেছেন।

সারদা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন রাজ্যের মানুষকে। চিটফান্ড কাণ্ডে সিবিআই তদন্তকে বারবারই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তব হল, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই সিবিআই তদন্তের দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান এবং কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁদের দায়ের করা মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট এই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে যতই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুন না, ভবি তাতে শেষ পর্যন্ত ভুলবে বলে মনে হচ্ছে না। মানুষ দেখেছে গত সাতবছরে কারা চিটফান্ডের মালিকদের সঙ্গে গলাগলি করেছে, চিটফান্ডের টাকায় কাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যতই রাজ্যব্যাপী উত্তেজনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি জায়গায় কিছু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ করেছিল। তা বাদে সমগ্র রাজ্যই মুখ্যমন্ত্রীর ডাককে উপক্ষো করে স্বাভাবিক অবস্থাকেই রক্ষা করেছে। আসলে মানুষ এটুকু বুঝেছে, মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন, আসলে সিবিআইয়ের অভিযান বাংলা বা রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে নয়। এ অভিযান পশ্চিমবঙ্গকে যারা লুটেপুটে খাচ্ছে, সেইসব চোরকে ধরার অভিযান।

গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে বোধ হচ্ছে সারদা কাণ্ড এবার শেষ অঙ্কে পৌঁছতে চলেছে। হয়তো শিলংয়েই আর একবার লেখা হবে শেষের কবিতা। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে মমতা কি নিজেই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা চাইছেন?

চন্দ্রভানু ঘোষাল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন রাজীব কুমার কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ধরনায় বসলেন, সেদিন একটা প্রশ্ন হাওয়ায় ভাসছিল। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মমতা ধরনায় বসে যে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করলেন, এরপর কি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করবে? প্রশ্নটা নেহাত কাকতালীয় ছিল না। কারণ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব কী চায়? রাজ্যের নেতারা কি চান সাংবাবিধানিক সংকটের বিষয়টি মাথায় রেখে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করুক? নেতারা জানান, না, তাঁরা তা চান না। কারণ তাতে মমতা শহিদ হয়ে যাবেন এবং সহানুভূতির ভোট কুড়িয়ে বাজিমাত করবেন। পরে বিজেপির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এই কথা সাংবাদিকদের জানান। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠে এসেছে। প্রশ্নটি অদ্ভুত এবং আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রশ্নটি হলো, সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে মমতা কি নিজেই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা চাইছেন? মেট্রো চ্যানেলে তাঁর বহুচর্চিত ধরনা কি একটা ফাঁদ? সোজা কথায়, তিনি চাইছেন বিজেপি তাঁর পাতা ফাঁদে পা দিক এবং রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুক। যাতে তিনি সহানুভূতির ভোট সম্বল করে বিনা বাধায় নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেন। আমাদের মনে রাখা দরকার, উনিশের লোকসভা নির্বাচন বিজেপির কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ মমতার কাছেও। যত বেশি সংখ্যক আসনে তাঁর দল জিতবে জাতীয় রাজনতিতে ততই বাড়বে তার গুরুত্ব। দৈবাৎ যদি বিরোধীরা জিতে যায় কিংবা ত্রিশঙ্কু সংসদ সৃষ্টি হয়, বেশি আসন হাতে থাকলে দরকষাকষিতে তিনি সুবিধা পাবেন। যেসব মন্ত্রকে উপরির বন্দোবস্ত আছে, ভাইপোর জন্য সেরকম কোনও মন্ত্রকও বাগিয়ে নিতে পারবেন।

সেই জন্যেই কি ধরনার নাটক করে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির পরিকল্পনা? সঙ্গত কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রশ্ন করা যায়। কারণ সিবিআই কর্তারা যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে সারদা কাণ্ডের তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবেন, সেকথা তিনি আগেই জানতেন। এই নিয়ে তিনি লালবাজারের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। অর্থাৎ সিবিআই কর্তারা রাজীবকুমারের বাংলোয় যাবার পর তাদের কীভাবে আটকানো হবে তা ওই বৈঠকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ৪ ফেব্রুয়ারি ছিল রাজ্যের বাজেট পেশ করার দিন। বিধানসভায় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রীসভার অনুমোদন প্রয়োজন। ধরনামঞ্চের নিকটবর্তী পুলিশ কিওস্কে যাতে মন্ত্রীসভার বৈঠক করা যায় সে ব্যবস্থাও মমতা আগেই করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে মমতা অনেক আগে থেকে রীতিমতো পরিকল্পনা করে এগিয়েছেন। একেবারে অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়েছেন মেট্রো চ্যানেলে।

মমতার অঙ্কের গোড়াতেই রয়েছে সাম্প্রতিককালে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের সভায় উপচে পড়া ভিড়। ঠাকুরনগরের পুলিশের দেওয়া

সি বি আই অফিসারকে হেনস্থা করছে কলকাতা পুলিশ।

তথ্য অনুযায়ী মতুয়া মহাসঙ্ঘ আয়োজিত সভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল। অথচ এর চারদিন পর তৃণমূলের জবাবি সভায় পনেরো হাজারের বেশি লোক হয়নি। এও পুলিশের দেওয়া হিসেব। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে সেটা মমতা জানেন। একথাও জানেন বিজেপির সর্বভারতীয় হেভিওয়েট নেতারা এই গ্রহণযোগ্যতাকে ভোটে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখেন। এত বৈচিত্র্যসম্পন্ন নেতৃত্ব তাঁর দলে নেই। সেখানে তিনি একাই সব। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে বিজেপির এই বহুধাবিস্তৃত নেতৃত্বের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। সুতরাং তাঁর এমন একটা মাধ্যম চাই যা তাকে মিডিয়া কভারেজ দেবে এবং একক চেষ্টায় তিনি বিরোধী জোটের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন। ১৯ জানুয়ারি ব্রিগেডের সভায় বিস্তর লম্ফঝম্ফ করলেও তাঁর সাধ পূর্ণ হয়নি। কোনও নেতাই তাঁকে ফেডেরাল ফ্রন্টের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। ধরনার নাটক করার পরেও সেই স্বীকৃতি এখনও পর্যন্ত জোটেনি, কিন্তু তাতে কী! মমতা মনে করছেন বিরোধী নেতারা যে তাঁর জন্য দৌড়ঝাঁপ করছেন এটাই তাঁকে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি। মুখে তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন।

এবার আসা যাক পরিকল্পনার দ্বিতীয় অঙ্কে। সাম্প্রতিক অতীতে দুটি ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী জয় এবং প্রিয়াঙ্কা বঢরার রাজনীতিতে পদার্পণ। তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে রাহুল গান্ধী মমতাকে টেক্কা দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব এবং মায়াবতী স্পষ্টতই রাহুলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। রাহুলের আত্মম্ভরী চালচলনে বিরক্ত হয়ে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ান। এতদ্‌সত্ত্বেও মমতা জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কল্কে পাননি। এরপর ঘটল প্রিয়াঙ্কা বঢরার রাজনীতিতে পদার্পণ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার বলেছিলেন, প্রিয়াঙ্কা আমার মতোই সিরিয়াস। শুধু এই কথার ওপর ভিত্তি করে প্রিয়াঙ্কা যেমন ঠাকুমার শাড়ি পরার, চুল কাটার স্টাইল রপ্ত করলেন, ঠিক তেমনই কংগ্রেসিরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, প্রিয়াঙ্কা এলেই কংগ্রেসের মৌরসিপাট্টা আবার গেড়ে বসবে। পুরনো কংগ্রেসি হিসেবে মমতাও হয়তো প্রিয়াঙ্কার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। হয়তো মনে করেন শুধু প্রিয়াঙ্কা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন বলেই বিরোধী নেতারা, যাদের কোনও সর্বভারতীয় জনভিত্তি নেই, তাঁরা আবার কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। এবং মমতার হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। মমতা এবং তার দোসর নেতারা যাই বলুন, কংগ্রেস যদি বিরোধীদের নেতৃত্ব দেয় তাহলে গান্ধী পরিবারের কোনও সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হবেন। এতদিন পরিবারের সদস্য হিসেবে শুধু রাহুল গান্ধী ছিলেন, এখন আবার প্রিয়াঙ্কা এসে জুটলেন। সুতরাং মমতার ভয় তো হবেই। প্রধানমন্ত্রী না হতে পারলে তো তার কোনও লাভ নেই। অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে নতুন করে তদন্ত না করলেও, শুধু তাকে বশে রাখার জন্য তাঁর এবং তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চলা সব মামলা জিইয়ে রাখবেন। সেটা তিনি কীভাবে হতে দিতে পারেন?

৩ ফেব্রুয়ারি ধরনার পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে এইসব যুক্তি। গোটা ব্যাপারটা যে পূর্বপরিকল্পিত সেটা মমতা এবং তাঁর 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ' পুলিশ অফিসারদের আচরণেও স্পষ্ট। পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বাংলো হাইসিকিউরিটি জোনের মধ্যে পড়ে। বিনা অনুমতিতে সেখানে যাওয়া যায় না। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অনুমতি দিয়েছিল বলেই সিবিআই অফিসাররা গিয়েছিলেন। পুলিশের অভিযোগ, সিবিআই অফিসাররা ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাংলোয় সার্চ করতে গিয়েছিলেন। তাই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডাহা মিথ্যে কথা! সিবিআই অফিসাররা সার্চ করতে যাননি, পুলিশ কমিশনারকে গ্রেপ্তার করারও কোনও উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তিনবার নোটিশ পাঠাবার পরও রাজীব কুমার তদন্তে সহযোগিতা না করায় তারা সশরীরে গিয়েছিলেন স্রেফ জিজ্ঞাসাবাদ করতে। এবং তার জন্য কোনও ওয়ারেন্ট লাগে না। সুতরাং মমতা মিথ্যে কথা বলছেন। তার সুরে সুর মেলাচ্ছে কলকাতার দলদাস পুলিশও। সঙ্গত কারণেই সুপ্রিম কোর্ট রাজীব কুমারকে তদন্তে সহযেগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তাঁর নৈতিক জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আরও বলেছেন, রাজীব কুমার নাকি নিরপেক্ষ কোনও জায়গায় সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে পাঁচবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু সিবিআই তার একটিরও উত্তর দেয়নি। প্রশ্ন হলো, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না কেন? সিবিআইকে ভর্ৎসনাই বা করলেন না কেন? বোঝাই যায়, একটার পর একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে এবং আগের মিথ্যেকে পরের মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে গিয়ে এক দুর্ভেদ্য মিথ্যাচারের জালে জড়িয়ে পড়ছেন মমতা। যতই তিনি নিজেকে সততার প্রতীক বলে জাহির করুন, তাঁর হাওয়াই চটি এবং সুতির শাড়ির মিথ অনেক আগেই ভেঙে গেছে। নষ্ট হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা। সেই কারণেই তাঁকে বৈধ একটি তদন্তপ্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ধরনার নাটক করতে হয়।

তবে মমতা যতই বিরোধী রাজনীতির প্রধান মুখ হয়ে ওঠার জন্য ধরনায় বসুন, তাঁর পশ্চিমবঙ্গীয় অনুচরেরা নিশ্চয়ই তাতে ক্ষুব্ধই হয়েছেন। মমতাকে ভাঙিয়ে তাঁরা রাজনীতি করেন— এমনকী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের অবস্থানও মমতার অনুকম্পায়— তাই মমতার কোনও কাজের প্রতিবাদ করার সাহস হয়তো তাদের নেই। কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবেন, সিবিআই এর আগে তৃণমূলের তিন স্তম্ভ মদন মিত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাপস পালকে গ্রেপ্তার করেছে, কই তখন তো মমতা ধরনায় বসেননি? রাজীব কুমারকে বাঁচানোর জন্য তিনি এমন উঠে পড়ে লেগেছেন কেন? সারদা কাণ্ডে তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের যোগ সম্বন্ধে কতটা জানেন রাজীব? সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্য সরকার যে সিট গঠন করেছিল তার শীর্ষে ছিলেন রাজীব। সেই সময় তিনি প্রচুর তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের মধ্যে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণভোমরাও আছে? সেই জন্যেই কি মমতা ছুটে গিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনারের বাংলোয়? অর্থাৎ তিনি জানতেন বাংলোরই কোনও গোপন স্থানে রাজবী কুমার লুকিয়ে রেখেছেন তুরুপের তাস। এসব অনুমান, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান। সময়ের গর্ভে রয়েছে এর উত্তর। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রাজীব কুমারকে তৈলমর্দন করছেন তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট, পুলিশ কমিশনার অনেক কিছু জানেন। সেই 'অনেক কিছু' যদি সিবিআই জানতে পারে তাহলে মমতার বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

কংগ্রেস কতবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিসংখ্যান-সহ তা লোকসভায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আশা করাই যায় কংগ্রেসের জুতোয় তিনি পা গলাবেন না। মমতাকে তাঁর স্বখাত সলিলে ডুবতে দেবেন। তারপর মে মাসে তিনি মুখোমুখি হবেন উজ্জীবিত বিজেপির। যাঁরা বলছেন, বিজেপির মজবুত সংগঠন নেই, তাঁরা এখনও তৈরি নয়, তাঁদের উদ্দেশে বলি, ২০১১ সালে তৃণমূলের সংগঠনও মজবুত ছিল না। মানুষ ভোট দিতে পেরেছিল বলে তারা জিতেছিল। এবারও যদি মানুষ ভোট দিতে পারে বিজেপিও ভালো ফল করবে। সে মমতা যতই নৌটঙ্কি করুন। যাঁরা ধর্মযুদ্ধে সত্যের পক্ষে, জয় হয় তাঁদেরই। একথা মহাভারতের যুগেও সত্যি ছিল, আজও সমান সত্য। ■

অভিযুক্ত পুলিশ কমিশনারকে বাঁচাতে ধরনা

সত্যাগ্রহের নামে দেশদ্রোহিতার নোংরা ষড়যন্ত্রে মেতেছেন মুখ্যমন্ত্রী

সনাতন রায়

২০১১ সালে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস আসার পরে সরকারি অফিসাররা কানাঘুষো করতেন— সরকার নয়, সার্কাস চলছে। আজ ২০১৯। সেই সার্কাস আজও চলছে। শুধু চলছে না, আরও মেদবহুল হয়ে সেই সার্কাসের জোকারে পরিণত হয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সাম্প্রতিক নজির কলকাতার ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে তার ধরনা।

এ ঘটনা নজিরবিহীন। কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী খোলা রাজপথে ধরনায় বসেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা, রাজ্য পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল সহ রাজনৈতিক পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে— এমন ঘটনা শুধু ভারতবর্ষে কেন, গোটা বিশ্বেই কখনও হয়নি। ধরনার কারণটা আরও বিস্ময়কর। মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের ১৩ তলায় তাঁর বাগানবাড়ির মতো সাজানো গোছানো প্রশাসনিক প্রধানের দপ্তর ছেড়ে একেবারে রাজপথে এসে বসলেন একজন পুলিশ কমিশনারকে পাহারা দিতে, যে পুলিশ কমিশনারেরই দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে পাহারা দেওয়ার। তাও কেন? যাতে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটকারী বা খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত রাজীব কুমারকে সি বি আই অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের ঘোঁটের জোটনেতারা যখন প্রধানমন্ত্রীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছেন, ‘চৌকিদার চোর হ্যায়’, তখনই পশ্চিমবঙ্গের শহরের গ্রামের কোণায় কোণায় কানাঘুষো চলছে, ‘চোরের চৌকিদার মুখ্যমন্ত্রী।’ নেপথ্যে যে রয়েছে এক বিশাল ডাকাতির গল্প যে গল্পের মূল উপাদান ৪০ হাজার কোটি টাকা, তা আর বুঝতে বাকি রইল না মানুষের। সেই মানুষ যারা বামফ্রন্টের বিরোধিতা করে, লাঠি, বুলেটের মোকাবিলা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তনের স্লোগানে সমর্থন জানিয়ে লাখো লাখো ভোট দিয়েছিলেন দুটি পাতা একটি ফুল চিহ্নে।

পরিষ্কার হয়ে গেল, ‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’ প্রবাদবাক্যটি নেহাত কথার কথা নয়। উদঘাটিত হলো আরও একটি বাস্তবতা শুধু মাসতুতো ভাইয়েরাই নয়, কখনও কখনও মাসতুতো বোনও চোর হয়। অথবা দিদি হয় শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

দিদি আর দিদির ভাইয়ের এই চোর চোর খেলার সূত্রপাত হয়েছিল বহু আগেই সেই বাম জমানায়। বাম জমানার শাসককুল দীর্ঘদিন ধরেই চিটফান্ডের মধু খেয়েছেন। কিন্তু ২০১১ সালে ক্ষমতায় পা রাখার কয়েকমাস আগে থেকেই চিটফান্ড রাজত্বের মুকুটহীন সম্রাট রোজভ্যালির গৌতম কুণ্ডু, সারদার সুদীপ্ত সেন, আই কোরের অনুকূল মাইতি কিংবা এমপিএস-এর প্রমথনাথ মান্নাদের কলার ধরতে শুরু করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। চিটফান্ড সংস্থাগুলিও বুঝেছিল, বামফ্রন্টের শ্বাসকষ্ট উঠে গেছে। অতএব মানুষ ঠকানোর কারবার চালিয়ে যেতে গেলে তৃণমুলের হাত ধরতে হবে।

হলোও তাই। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় ওই সব চিটফান্ড সম্রাটদের শোষণের খেলা। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট খেয়েছিল ধীরে সুস্থে। কিন্তু শুকনো ছারপোকা হলে যা হয়, তৃণমূল কংগ্রেস খিদের চোটে এত বেশি খেতে

শুরু করল যে, ওইসব সম্রাটদের রাজত্ব রক্ষা করা তো দূরের কথা— পরনের লজ্জাবস্ত্র ধরেও টানাটানি শুরু হয়ে গেল। পাঠককুল স্মরণ করুন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সারবন্দি অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। দাতা কে? সারদা চিটফান্ডের মালিক সুদীপ্ত সেন। ব্যবস্থাপনায় সারদা থেকে মাসিক ১৬ লক্ষ টাকা বেতনের 'সাংবাদিক' কুণাল ঘোষ। কালিম্পঙের জেলায় গোপন মিটিং করছেন মুখ্যমন্ত্রী কার সঙ্গে? সুদীপ্ত সেন আর রোজভ্যালির গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গে। সৌজন্যে সেই কুণাল ঘোষ। যে মাওবাদীদের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রামে 'জনজাগরণ' ঘটাল, সেই মাওবাদীদের সঙ্গে রফা হলো কোথায়? এমপিএস কর্ণধার প্রমথনাথ মান্নার খাসমহল ঝাড়গ্রামে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটোদের বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার সম মানের আঁকা ঢাউস ঢাউস পেইন্টিংগুলো পাওয়া গেল কোথায়? রোজভ্যালির অফিসে। সারদার অফিসে ট্রাঙ্কের ভিতর। বিদেশ ভ্রমণ, আমেরিকার লাস ভেগাসে পদার্পণ, সপারিষদ পাঁচতারা, সাততারা হোটেলে অবসর যাপন চলছিল ভালোই। কিন্তু ওই যে বলে, লোভের বশে সোনার ডিম পাড়া হাঁসকেই কেটে ফেলা। তৃণমূল ঠিক সেটাই করল। শোষণের চাপে একদিন শ্বাসকষ্ট উঠে গেল সুদীপ্ত সেনের। বাধ্য হয়ে বলেন সব ফাঁস করে দিয়ে পকেটে মাত্র কয়েক লাখ টাকা নিয়ে 'নিখোঁজ' হয়ে যেতে। নিখোঁজটাও যে গটআপ ম্যাচ ছিল, তা বোঝা গেল পরে। সারদা চিটফান্ডের ৪০০০০ কোটি টাকা তখন আর সুদীপ্ত সেনের পকেটে নেই। নিঃস্ব নির্বান্ধব চিটফন্ড কর্তা সঙ্গিনী দেবযানীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন কড়া পুলিশি প্রহরায়। তারপর থেকেই জেলবন্দি তিনি। বিড়ি কেনার পয়সাও নেই। অন্য বন্দিদের ফেলে দেওয়া বিড়ির টুকরো কুড়িয়ে খান। বলির পাঁঠা হলেন কুণাল ঘোষও। দলীয় রাজ্যসভা সদস্য যিনি সারদা কর্তার সঙ্গে করমর্দন করিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর। লক্ষ লক্ষ প্রতারিত নারী-পুরুষের কান্নায় তখন বাংলার আকাশ মুখরিত। রাস্তাঘাটে, কোর্ট চত্বরে সে কান্না প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিদিন। আর জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী তখন ব্যস্ত ড্যামেজ কন্ট্রোলে। সিট গঠন, বিশেষ তহবিল গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি তখন নতুন নাটক রচনায় ব্যস্ত যাতে তদন্তের ভার কোনওভাবেই কেন্দ্রের হাতে পৌঁছে না যায়। প্রত্যেকটা মানুষ তখন চাইছিল— সিবিআই তদন্ত। বাধা দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করে দিলেন সি আই ডি তদন্ত। না হলে ড্যামেজ কন্ট্রোল হবে কী করে?

কিন্তু কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। তাই শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার হাজার চেষ্টা করেও সিবিআইয়ের হস্তক্ষেপকে আটকাতে পারেনি। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার চিটফান্ড

কেলেঙ্কারির তদন্তের ভার নিল সিবিআই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা সহকর্মী কংগ্রেস বিধায়ক আবদুল মান্নান এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, প্রখ্যাত আইনজীবী এবং সিপিআই এম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে। কারণ এই দুই জনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা রুখে দিয়েছিলেন সিবিআই-এর হস্তক্ষেপ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে। তা না হলে সব কুকর্ম অন্তরালেই থেকে যেত। এরপর লাইন দিয়ে একের পর এক তৃণমূলে নেতা আর ২/৪ জন মমতা- ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের জেরা করা শুরু করল সিবিআই। এবং তাদের একের পর এক জেলে ভরা হলো। জেলে ভরা হলো একটি টেলিভিশন সংস্থার কর্তব্যক্তিদেরও। কিন্তু এদের কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা হলেও, একবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের জন্য ধরনায় বসেননি। বিরোধিতা করে দু-চার কথা বললেও সক্রিয় বিরোধিতায় দেখা যায়নি তাঁকে বা তাঁর দলের অন্য নেতাদের। এমনকী মাঝে মাঝেই যখন চিটফান্ডে প্রতারিতরা দলে দলে বুকফাটা আর্তনাদ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির সামনে গিয়েছেন সুবিচারের আবেদন জানিয়ে, তখনও তিনি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছেন কৌশলে।

কিন্তু এবার নিজের হাতেই নিজের দুর্নীতির মুখোশটা ছিঁড়ে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। রাজীব কুমার— মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, যাঁর হাত দিয়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সব তথ্য কফিনে ভরতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে সিবিআই জেরা থেকে বাঁচাতে নেমে এলেন রাজপথে।

চিটফান্ড কাণ্ডে রাজীব কুমার রয়েছেন সন্দেহভাজনদের তালিকায় শুরু থেকেই। কিন্তু তিনিও প্রথম থেকেই সিবিআইয়ের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে এসেছেন। প্রথমবার ২০১৭-র ১৯ অক্টোবর, দ্বিতীয়বার ২০১৭-র ২৭ অক্টোবর, তৃতীয়বার ২০১৮-র ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর এবং চতুর্থবার ২০১৮-র ১৮ ডিসেম্বর জেরায় হাজির হওয়া তো দূরের কথা— উল্টে ডিজিকে দিয়ে জানানো হয় তিনি সিবিআইয়ের সঙ্গে কোনো এক জায়গায় মুখোমুখি বসতে পারেন অন্য সহকর্মীদের নিয়ে। বোঝাই যায়, এ প্রস্তাবের পিছনেও ছিল পরিকল্পিত কৌশল। কারণ তিনি জানেন, সুদীপ্ত সেন উল্লিখিত লাল ডায়েরিটি আছে তাঁর কাছেই। যেটিতে লেখা আছে কোন দলের কোন নেতাকে কত তারিখে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং সম্ভবত সেখানে এমন ২/১ জনের নাম রয়েছে যা প্রকাশ্যে এলে গোটা সরকার এবং শাসক দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে এবং গোটা ভারতবর্ষের মানুষ 'গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী, সততার প্রতিমূর্তি, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের মুখ, বাংলার ঘরের মেয়ের মুখে থুতু ছিটিয়ে বলবে— 'ছিঃ'। আর তাঁর ভাইয়েরা, ভাইপোরা যাঁরা তাঁরই প্রশ্রয়ে আজ হয়ে উঠেছেন বাংলার রঘু ডাকাত, কলিমুদ্দী মিঞা কিংবা দস্যু মোহনলাল, তাঁরা পচে মরবেন জেলে। লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত হওয়া পরিবারের চোখের জলে ডুবে কাটাবেন অভিশপ্ত জীবন যেমন আজ কাটাচ্ছেন সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডু, প্রমথনাথ মান্না, অনুকূল মাইতি, সুব্রত রায়রা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ধড়িবাজ রাজনীতিবিদ। যাঁরা তাঁকে ভাবেন ঘরের মেয়ের মতোই তিনি অতি সাধারণ, তাদের জেনে রাখা উচিত, তিনি যে সাদা সুতির শাড়িগুলি পরেন সেগুলি তৈরি হয় ধনিয়াখালিতে সবচেয়ে সেরা সুতো দিয়ে। এক একটি শাড়ির দাম

মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। তিনি যে হাওয়াই চটি পরেন তা ব্রান্ডেড। বিদেশি। তিনি যে ঘনঘন বিদেশ যান সাঙ্গপাঙ্গ পরিবৃত হয়ে, তাতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, তা আসে ঘুর পথে। আগে জোগাত চিটফান্ডের গৌরী সেনরা। এখন হয়তো তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করা বাংলার কয়েকজন ব্যবসায়ী যাঁদের কেউ কেউ জেলবন্দি, সিবিআইয়ের খপ্পরে। আর ধর্মতলার ধরনামঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভেজাল মিথ্যে আউড়ে যান। আমি ভিআইপিও নই। এল আই পিও নই। আমি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। আমি বই লিখে, গানে সুর দিয়ে যা টাকা রোজগার করি, তাতেই চালাই (এখন আর ছবি আঁকার কথাটা বিশেষ বলেন না)। কিন্তু কখনও স্বীকার করেন না, গোটা দক্ষিণ কলকাতার প্রোমোটিং ব্যবসাটা কার ভাইদের নিয়ন্ত্রণে। হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর ভাইপোর পাঁচতারা হোটেল সম বিলাসবহুল বাড়িটি তৈরি হলো কার টাকায়? পুরীতে কার মালিকানায় একটার পর একটা হোটেল গজিয়ে উঠল সমুদ্রতীরে?

কিন্তু একথাও ঠিক, শুধু সিবিআইয়ের হাত থেকে নিজেকে, নিজের দলকে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচানোই নয়, এই বিশাল ধামাকার পিছনে রয়েছে আরও অনেকগুলি বদ উদ্দেশ্য যেগুলিও সাধারণ মানুষের বোঝা দরকার।

প্রথমত, তাঁর উদ্দেশ্য হলো, আসন্ন লোকসভা ভোটের মুখে মোদী বিরোধী হিসেবে নিজের 'শ্রীমুখ'টিকে আরও একবার দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। বিশেষ করে সেইসব মোদী বিরোধী নেতাদের সামনে যাঁরা নিজেরাও রয়েছেন প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে। মমতা গত ১৯ জানুয়ারির ব্রিগেড জনসভা ব্যর্থ হওয়ার পর এমনই একটা সুযোগের সন্ধান করছিলেন যেখানে বিরোধী শক্তিদের আবার একজোট করা যায়। রাজীব কুমারকে রক্ষা করার অজুহাত তুলে তিনি বিরোধীদের আবার এক মঞ্চে শামিল করার চেষ্টা করলেন যদিও সে প্রচেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয়, এই সুযোগে তিনি আরও একবার বাংলার মানুষের কাছে 'গণতন্ত্রের পুজারি, সংবিধানের রক্ষক' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার অপচেষ্টা চালালেন। কারণ ভিতরে ভিতরে যতই চিন্তিত থাকুন না কেন, প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পুলিশ কমিশনারকে অন্যায়ভাবে সিবিআই গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। আমি সেজন্যই প্রতিবাদ করতে ধরনায় বসেছি। কিন্তু এখন তো মানুষ জেনে গেল, গ্রেপ্তার নয়, শুধুমাত্র জেরা করতেই এসেছিলেন সিবিআই অফিসাররা। কিন্তু গ্রামগঞ্জের অতি সাধারণ মানুষ কি এই সত্যটা সত্যিই বুঝবেন?

তৃতীয়ত, ধরনামঞ্চকে সত্যাগ্রহ আখ্যা দিয়ে তিনি গান্ধীজীকে অনুসরণ করছেন, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য কংগ্রেসের ভোট ছিনিয়ে নেওয়া। রাহুল গান্ধী নন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী নন, মমতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তিনিই প্রকৃত গান্ধীবীদী। কংগ্রেসের ভোট পেতে হলে গান্ধীজীকে মাথায় তুলে রাখতেই হবে। তাই ধরনা নয়, সত্যাগ্রহ।

চতুর্থ, ধরনায় বসেছেন রাজ্যের সব শীর্ষস্থানীয় আমলাদের সঙ্গে নিয়ে যাতে বাইরে থেকে এই ধরনাকে প্রশাসনিক ধরনা মনে হতে পারে, রাজনৈতিক ধরনা নয়। ক'দিন আগেই প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নে কংগ্রেস সাংসদ মৌসম নূরকে তৃণমূলে নিযুক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী যে সংসদীয় প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এখানে সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরও বড়ো সাংবিধানিক ভুলটি করে ফেলেছেন। কারণ আইনের চোখে রাস্তা কখনও প্রশাসনিক দপ্তরের ভূমিকা নিতে পারে না।

পঞ্চমত, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল যেনতেনপ্রকারেণ অন্তত ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজীব কুমারের মতো বন্ধু পুলিশ অফিসারকে জেলের বাইরে রাখা। যে প্রচেষ্টায় তিনি আংশিক সফল। কারণ এখন জেরা করা কালীন প্রয়োজন হলেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি লাগবে। অর্থাৎ রাজীব কুমার ধরা পড়ার পর তিনি এবং তাঁর দল যে ধনেপ্রাণে মারা যাবেন, তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তিনি এও জানেন, আসন্ন লোকসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন রাজীব কুমারের ওপর কিছু প্রতিবন্ধকতা খাড়া করবেই। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে দুর্নীতি খুব সহজ হবে না। কিন্তু তবু, যতদিন আটকে রাখা যায় ততদিনই মঙ্গল।

ষষ্ঠত, তাঁর এবং তাঁর দলের নেতাদের জমিদারিসুলভ এবং গুণ্ডাসুলভ আচরণ ও মনোভাবে পুলিশের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে প্রতিদিন। বলা যায় না, যে কোনোদিন রাজ্যে পুলিশ বিদ্রোহ ঘটে যেতে পারে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চাইলেন, তিনি কতখানি পুলিশের হিতাকাঙ্ক্ষী।

সপ্তমত, তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বারবার একটা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি বিজেপি বিরোধী নন। তিনি মোদী বিরোধী। অর্থাৎ এই ধরনা মঞ্চকে ব্যবহার করে তিনি একদিকে যেমন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে ভাঙন ধরাতে চেয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে ভোটের পর হালে পানি না পেলে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার রাস্তাটাও খুলে রাখতে চেয়েছেন।

অষ্টমত, তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, কেন্দ্রের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে কেন্দ্র বাধ্য হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অথবা গোটা রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ১৯৭৫ সালের ইন্দিরা গান্ধী সাজতে চাইছেন যিনি গ্রেপ্তার হয়ে পরবর্তী নির্বাচনে বিপুল মাত্রায় সহানুভূতি ভোট পেয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন। মমতা বুঝেছেন, মানুষের মনোভাব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভালোমানুষির চালটা মানুষ ধরে ফেলেছে। গ্রামেগঞ্জে দল নিয়ন্ত্রণবিহীন। অত্যাচারে অনাচারে জর্জরিত মানুষ। উন্নয়নের প্রচারটা যে ঢক্কানিনাদ তাও বুঝতে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে না। প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলে মার খেতে হবে, খুন হতে হবে, ঘর পুড়বে, কন্যা-স্ত্রী ধর্ষিতা হবে। তাই সব ক্রোধ ছাইচাপা আগুন হয়ে জ্বলছে ধিকিধিকি করে। সুযোগ পেলেই সেই আগুন ছিটকে পড়বে ভোটের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে। জনগণকে মুরগি করে মুখ্যমন্ত্রীর আখের গোছানোর দিন শেষ হয়ে এসেছে, সেটা বুঝেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। তাই কৌশলে নিজেকে শহিদ বানাতে চাইছেন। বলা যায় না, ওইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তিনি হয়তো যে কোনো দিন ভোটের আগেই গোটা রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে ধর্মের জিগির তুলে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে চাইবেন। বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এনে জেলবন্দি করবেন যাতে তাঁরা ভোট প্রচারে অংশ নিতে না পারেন। মানুষের কাছে সত্য ঘটনা তুলে ধরতে না পারেন। সবচেয়ে বড়ো কারণ, তিনি সংবিধানের বিরোধিতা করে ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর শিকড়ে আঘাত

হানতে চাইছেন। বারবার প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করছেন। কেন্দ্রের প্রকল্পকে রাজ্যের নামে প্রচার করছেন। যেখানে সমালোচনার মুখে পড়ছেন, যেখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্পেরই বিরোধিতা করছেন। সাম্প্রতিক ঘটনা আরও মারাত্মক। তিনি রাজ্য পুলিশকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দিচ্ছেন। আইপিএস এবং আই এ এস অফিসারদের নিয়ে ধরনায় বসছেন। সর্বোপরি দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধরনায় বসতে চলেছেন। কলকাতায় বসে যেমন রাজ্য পুলিশ ও সিবিআই অফিসারদের লড়াইয়ের ময়দানে নামতে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন, তেমন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে বলে দোষারোপ করছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা যা ঘটেনি সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং মিথ্যা প্রচার করছেন সিবিআই বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও তদন্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে। এরপর হয়তো দেখা যাবে তিনি সামরিক বাহিনীকেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উস্কানি জোগাবেন যাতে পাক সেনাবাহিনী উৎসাহিত হয়। আসলে যে কথা অনেকদিন ধরেই কানাঘুষো চলছে— তিনি চাইছেন স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন স্বৈরাচারী প্রশাসক হিসেবে। এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মেতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এখনই ব্যবস্থা না নিলে চরম পরিণতির দিকে পা বাড়াবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র। গোটা ষড়যন্ত্র ফাঁস করার জন্য দরকার এখনই সমস্ত নথিপত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করা যাতে ষড়যন্ত্রের জাল আর ছড়াতে না পারে। দরকার চক্রান্তকারীদের অবিলম্বে জেলে ভরে চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে ফেলা। ভারতবর্ষকে আবার দ্বিখণ্ডিত করার সমস্ত ষড়যন্ত্রের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া।

অর্থাৎ এক ঢিলে তিনি একটা নয়, অনেকগুলো পাখি মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সুপ্রিম কোর্ট তাঁর সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। এবার আর বাংলায় নয়, রাজীব কুমারের জেরা চলবে মেঘালয়ে। যেখানে পুলিশের হাত থেকে রাজীব কুমারকে ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা বাক্স বাজানোর কোনোও সুযোগ নেই। আর কোনও অজুহাতেই রাজীব কুমার সিবিআইয়ের প্রশ্নবাণকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। হয় তাঁকে জেলে যেতে হবে, নয়তো রাজসাক্ষী হয়ে নতুন রাজনীতিতে যোগ দিতে হবে বাঁচার স্বার্থে। কারণ লাল ডায়েরির পাতাগুলো লাল হয়ে গেলেও স্ক্যানারে তা ধরা পড়বেই। তখনই এক একটি মহীরুহের পতন শুরু হবে। তার মধ্যে সব ভাই, সব ভাইপোরাই থাকবেন যাদের মুখ ধরনা মঞ্চে হয় দেখা যায়নি, নতুবা দেখা গেছে ক্বচিৎ কদাচিৎ। এখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন যেমন দূর-অস্ত, তেমনি দূর-অস্ত তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্নও। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়েছেন রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে। দুর্নীতির ইতিহাসের অমর কষাঘাত কখন কোনদিক থেকে আছড়ে পড়বে— দুজনের কেউই তা অবগত নন। অতএব আপাতত গলাবাজি ছাড়া রাস্তা নেই। তাও গলার স্বর এখন দৃশ্যতই অনেকটা ক্ষীণ। তার ওপর ব্রিগেডে বামপন্থী সমাবেশ আর ঠাকুরনগরে খোদ মতুয়াপল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সভায় জনসমাগম মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চিন্তায় ফেলেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজেপির ওপর সশস্ত্র আক্রমণের পাল্টা প্রতিঘাত যেভাবে নেমে আসছে, দল হিসেবে তৃণমূল তাতে রীতিমতো চিন্তিত। আর্থিক জোগান দিতেন যে এস ডি এফ কর্তা (শ্রীকান্ত মেহতা), তিনি জেলবন্দি। সিবিআই নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসায়ী শিবাজী পাঁজা। চারপাশে হালকা হয়ে এসেছে বাংলা সিনেমার চলচ্চিত্র আর টিভি সিরিয়ালের তারকাদের ভিড়। নির্বাচন কমিশনও কলকাতায় ফুল বেঞ্চ নিয়ে সভা করে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন— এবার ভোটে মানুষের ভোট মানুষই দেবে, ভূতে নয়। বাংলার তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলির একটি দুটি করে নিয়ন্ত্রণের বেড়া ভাঙতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলি এ রাজ্যের সরকার ও শাসকদলের ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে। বাংলার সাংবাদিকরা যখন মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা এবং সাহস হারিয়েছেন, তখন অন্য রাজ্যের সাংবাদিকদের কড়া প্রশ্নবাণে হেনস্থা হতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে। আর যতই চাপ বাড়ছে নিজের মনোবল আলগা হচ্ছে। আলগা হচ্ছে মুখের ভাষা, নৈতিকতার বাঁধন। ভুল বকছেন মমতাদেবী। তা না হলে সুপ্রিম কোর্টের এত কঠোর অর্ডারের পরও তিনি কীভাবে বলতে পারেন, 'আমাদের নৈতিক জয় হয়েছে'?

২০০৬-এ কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে তাঁর ২৬ দিনের অনশন পরবর্তী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিল। আর ওই অনশন মঞ্চেই সেদিন অভিষেক হয়েছিল ভাইপো অভিষেকের। ২০১৯-এর মেট্রো চ্যানেলে তাঁর ধরনায় অভিষেককে দেখা গেছে কিছুক্ষণের জন্য এবং একদিনই। বদলে দেখা গিয়েছে নতুন মুখ মুন্নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের মেয়ে। হয়তো মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গেছেন সিবিআই স্ক্যানারে রয়েছে অভিষেক। ভবিষ্যৎ কী কেউ জানে না। পরিবর্তে উঠে আসুক নতুন মুখ। পরিবারেরই কেউ। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর সম্পত্তি। পরিবারতন্ত্রকে ধরে রাখার রাশ এখন তাঁর হাতেই। তাই নতুন মুখের আমদানি। দূরদৃষ্টির পরিচয়! কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল ভাবছেন। ২০০৬ আর ২০১৯ এক নয়। একই খেলা বারবার খেলে মানুষের জনসমর্থন আদায় যেমন সহজ নয়, তেমনি সত্যকে অগ্রাহ্য করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাও সহজ নয়।

মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে যাচ্ছেন— ইতিহাস বড়ো নির্মম, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গেই পালাবদল হয় রাজনীতির, রাজনৈতিক নেতৃত্বের। সেখানে কোনও মিথ্যাচার, কোনও চালাকি বা কোনও কৌশল কাজ করে না। কথা বলে সময়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কান পাতুন। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুনতে পাবেন নতুন কথা। নতুন কণ্ঠস্বর। নতুন দিনের গান। একরাশ স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সংবিধান বিরোধিতা নয়। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কুমন্ত্রণা নয়। স্বৈরাচার নয়। দেশদ্রোহিতা নয়। এক নতুন জনজাগরণের বাংলা। ■

ALWAYS EXCLUSIVE
NR Vandana ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

বিস্মৃতির অন্তরালে

মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ধারণকারী গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার

সমীর চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দুশো বছর ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের শাসনাধীন। তার আগে ছিল মুসলমান শাসনাধীন। তবে তফাত এই যে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্প, কলা, সাহিত্যে ইংরেজরা ছিল উন্নত। ইংরেজ আমলে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতার হিন্দু কলেজ। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ফলে ছাত্রদের জ্ঞান লাভ করতে এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে প্রবেশ করার সামর্থ্যে হিন্দু কলেজ তথা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যেসব কৃতী ছাত্র তাঁদের কর্মকীর্তির মাধ্যমে বাঙ্গালির মুখ উজ্জ্বল করেছিল তাঁদেরই একজন ছিলেন রাধানাথ শিকদার। তাঁর ছিল দেশ, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতি রুচি। আজকের এই সদাব্যস্ত বিশ্বায়নের যুগে তাঁকে জানবার আগ্রহ নেই বললেই চলে।

বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল রাধানগরের সুসন্তান রাজা রামমোহনের হাত ধরে, আর তা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন হলেন এই রাধানাথ শিকদার। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, সার্ভে বিজ্ঞানী (জরিপের কাজ), সক্রিয় সমাজ কর্মী, আবহাওয়াবিদ, মাতৃভাষায় শিক্ষা দান বিষয়ে অগ্রণী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাঁর পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। এই শিকদার পদবিভুক্ত মানুষেরা কলকাতার প্রাচীন অধিবাসী। আধুনিক উত্তর কলকাতা অঞ্চলে শিকদার বাগান লেন নামে একটা মহল্লা আছে। অনুমান হয় ওই মহল্লাতে আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বে বসবাস করতেন রাধানাথ শিকদারদের পূর্বপুরুষেরা। তিতুরাম শিকদারের দুই পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন রাধানাথ শিকদার। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে একাধিক ক্রমে ৮/৯ বছর তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন অধ্যাপক রূপে ওই কলেজে যোগদান করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ইতিহাস ও ইংরাজি সাহিত্যে অধ্যপনা করতেন। রাধানাথ শিকদার ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র।

রাধানাথ তাঁর অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠিত ইয়ংবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেছিলেন। যদিও তিনি সাংসারিক জীবনে ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত। তাঁর শিক্ষক ডিরোজিও তাঁকে যুক্তি মেনে নিয়ে কোনো কাজে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। তাই দেখা যায় সাংসারিক জীবনে তাঁর মা এক নিতান্তই বালিকার সঙ্গে বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলে গুরুর শিক্ষার বিরোধী ভেবে তিনি বিবাহ করেননি। কলেজে পঠনকালে গণিত বিষয়ে রাধানাথের নৈপুণ্য দেখে অধ্যাপক ডিরোজিও উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। যার ফলে রাধানাথ উৎসাহিত হয়ে গণিত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এজন্য অধ্যাপক ডিরোজিও তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন জরিপ বিজ্ঞান সার্ভে শিখতে। এই জরিপ বিজ্ঞান সমতল, টিলা, অল্প উচ্চ পাহাড়, অতি উচ্চ পাহাড় ইত্যাদি পরিমাপ করতে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে।

ডিরোজিও সাহেব ছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজ। তিনি তাঁর স্বদেশের উঁচু নীচু সমুদ্রতল পরিমাপ করার অভিজ্ঞতা নিয়েই এদেশে এসেছিলেন। তখনকার কলকাতা ছিল ভারতের তথা প্রাচ্যের রাজধানী। ইংরেজরা লন্ডনের পরই কলকাতা শহরকে গণ্য করতেন শাসন ক্ষমতা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র রূপে। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে প্রশাসনিক বড়ো বড়ো পদে লন্ডন থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে ইংরেজ যুবকরা যোগদান করতেন কলকাতায় বিভিন্ন পদে। এই ভাবেই সে সময় ইংল্যান্ড থেকে জর্জ এভারেস্ট সাহেব এসে যোগদান করেছিলেন 'সার্ভেয়ার জেনারেল অব্ ইন্ডিয়া' পদে। তিনি এসেই একটা পরিকল্পনা করেন সমগ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণ থেকে উত্তর জরিপ করার কাজ। দক্ষিণ ভারতের তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থল কন্যাকুমারী থেকে গাড়োয়াল হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সার্ভে করার কাজ শুরু করেন। ইতিহাসে যার নাম বিখ্যাত হয়ে আছে 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে' বা জি.টি.এস.।

এই পরিকল্পনাকে রূপদান করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় প্রচণ্ড ধীশক্তি সম্পন্ন গণিত ও জরিপ বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতীয় কিছু প্রাণচঞ্চল যুবকের। সেই

সময় রাধানাথ শিকদারের জীবনে ঘটে যায় মণিকাঞ্চন যোগ। রাধানাথ যখন কলেজের শেষ বছরে অধ্যয়নরত তখন হেনরি ডিরোজিও অধ্যাপক পদ থেকে অন্য দায়িত্বে চলে যাওয়ায় ওই শূন্য পদে এসে যোগদান করেন নতুন ইংরেজ অধ্যাপক জন ট্রেটলার। তাঁর অতীব প্রিয়পাত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখনকার ছাত্র রাধানাথ শিকদার। জন ট্রেটলার সাহেবও জিটিএস-এর কাজে যোগদান করেন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। যদিও রাধানাথ ছিলেন খুবই মেধাবী তবুও দরিদ্র পিতাকে সাহায্য করতে চাকরি করতে বাধ্য হন। পিতার সংসার চালনার উপযুক্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় তাঁর মেধাবী পুত্রকে উচ্চশিক্ষা থেকে নিবৃত্তি করে চাকুরি জীবনে প্রবেশের অনুমতি দিতে দ্বিমত করেননি। রাধানাথ শিকদার ছিলেন মেধাবী তথা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী।

তাই এই কাজে যোগদানের এক বছর পরই কর্মে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে কর্নেল জর্জ এভারেস্ট সাহেব তাঁর পদোন্নতি ঘটিয়ে উচ্চপদ সার্ভেয়ারের পদে উন্নীত করে পাঠান হিমালয়ের কোণে শেষ সমতল জায়গা দেরাদুনে। তখনকার দিনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মানসিকতায় ভারতবাসী মানেই ঝাড়ফুক, তন্ত্রসাধনা, ভিক্ষুক এই উপমা সত্ত্বেও নব উদ্যোমে তিনি কাজে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে গেলেন। নতুন পদে যোগ দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে বছর দুয়েক কাজ করার পর তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং গণিত শাস্ত্রের উপর নিখুঁত অভিজ্ঞতা দেখে জর্জ এভারেস্ট সাহেব অভিভূত হয়ে যান। ফলস্বরূপ রাধানাথ শিকদারকে তাঁর মস্তিক প্রসূত গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে প্রজেক্টে সুপারেন্টেন্ড পদে উন্নীত করেন। উঁচু-নীচু পাহাড়-সমতল ইত্যাদি মাপার কাজে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রয়োগে নিপুণ ভাবে কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষমতা দেখে জর্জ এভারেস্ট সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করেন। বন্ধু টেলর সাহেবের সুপারিশ মেনে নিয়ে রাধানাথ শিকদারকে নিয়োগ করা অত্যন্ত সঠিক কাজ হয়েছে তা বুঝতে পারেন। এক কথায় রাধানাথের কর্মদক্ষতা তাকে ভীষণভাবে গুণমুগ্ধ করেছে। ইংরেজ জাতির একটা গুণ— তাঁরা মানীর মান রাখতে জানেন।

রাধানাথ শিকদারই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রকে সর্বপ্রথম ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সফল হন। এক কথায় রাধানাথ শিকদারই ছিলেন এই কাজের পথিকৃৎ। এতে জর্জ এভারেস্ট সাহেব রাধানাথ শিকদারের কর্তব্য, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যবহারিক জ্ঞান, অতীব কষ্টসহিষ্ণুতা এই দিকগুলি বিচার করে তাকে পারিতোষিক সহ পুনরায় উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তবে এবার তাঁর নিয়োগ হয় অন্য বিভাগে অর্থাৎ প্রশাসনিক বিভাগে। সেটা ছিল গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে স্কিম প্রশাসন বিভাগে কালেক্টর পদে। কিন্তু এই কাজে যোগদানের পূর্বে তিনি জর্জ এভারেস্ট সাহেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন জর্জ এভারেস্ট সাহেব তাঁকে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে পদেই থেকে যেতে বলেন। কারণ তার মতো যোগ্যতাপূর্ণ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ভারতীয় কর্মচারী পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই রাধানাথকে এই রকম প্রজেক্টে থেকে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

জর্জ এভারেস্ট সাহেব তাঁকে এই পদে রাখার স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে দেখান যে, যেহেতু ডেপুটি কালেক্টর পদটি মূলত প্রশাসন বিভাগের। তাই ওই কাজের জন্য তখনকার ভারতবর্ষে অন্য অনেক ভারতীয় কর্মচারী তথা বিদেশাগত ইংরেজ কর্মচারী পাওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের মতো দক্ষিণ থেকে উত্তর সমগ্র ভারত সার্ভে করার মতো অত্যন্ত জটিল কাজে রাধানাথ শিকদারের মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারী ভারতীয়দের মধ্যে থেকে নয়ই, এমনকী ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে যোগ্যতায় এমন বিরল প্রতিভা যা রাধানাথের আছে তা কাজে লাগানোটাই ছিল জর্জ এভারেস্টের উদ্দেশ্য। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ আরও উচ্চপদে প্রমোশন পেয়ে আসেন কলকাতায়। এখানে , তাঁদের সান্নিধ্য লাভে তিনি সুযোগ পান তাঁর সতীর্থ ও সহপাঠী যাঁরা ছিলেন ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তখন তিনি একাকী থাকতেন উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে। কারণ তিনি ছিলেন অকৃতদার। এই সময় রাধানাথ শিকদারের কাজ ছিল দক্ষিণ ভারতের তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থল কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত নানা স্থানের ফিল্ড ওয়ার্কার তথা ডেপুটি সার্ভেয়ার কর্মচারীদের সংগৃহীত তথ্যগুলি পাঠ করা এবং সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা।

এই সময় ‘গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে’ বা জিটিএস-এর সর্বময় কর্তা জর্জ এভারেস্ট সাহেব কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নতুন বিভাগীয় প্রধান হয়ে আসেন কর্নেল অ্যান্ড্রুজ ওয়াগ সাহেব। তিনি তাঁর কর্মভার গ্রহণ করেই চেম্বারে ডেকে পাঠান রাধানাথ শিকদারকে। সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরি জর্জ এভারেস্ট সাহেব রাধানাথ শিকদারের এই বিশেষ বিভাগ পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে জানিয়েছিলেন। তাই নতুন কাজে যোগদান করেই রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে পরিচয় ও ভাব বিনিময় করেই তাঁকে একটি নতুন দায়িত্ব দেন ওয়াগ সাহেব। যে কাজটির দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় তাহলো হিমালয়ে নানা উচ্চতায় অবস্থিত চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গগুলির উচ্চতা নির্ধারণ করা এবং তার তার নিকটবর্তী মনুষ্য বসবাসের যোগ্য গ্রাম, টিলা, তার ভৌগোলিক অবস্থান, দূরত্ব (নিকটবর্তী সমতলভূমি দেরাদুন হতে) ও উচ্চতা নির্ণয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করা।

নতুন কাজের দায়িত্ব পেয়ে রাধানাথ শিকদার পূর্ণ উদ্যোমে মানচিত্র নির্মাণের কাজে লেগে পড়েন। এই কাজ করতে তাঁকে বিশেষ বেগ তেমন পেতে হলো না এবং তাতে সময়ও লাগল খুব কম। কারণ এই কাজে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ছিল তৎসহ তিনি নিজেই কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের নানা স্থানে কর্মরত সার্ভেয়ারদের পাঠানো রিপোর্টগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পুনরায় বিশ্লেষণ করে

তাতে তাঁর নিজস্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রয়োগ করে তিনি মানচিত্রটি তৈরি করলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করে দেন তাঁর যুগান্তকারী এবং ভবিষ্যৎ ভারতের সামরিক বাহিনীর তথা ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় হিমালয়ের XV–NO. শৃঙ্গটির গুরুত্ব। তার উচ্চতা নির্ধারণ করে জানান যে, শুধু ভারতেরই নয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গটি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৯২০০ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন এই শৃঙ্গটি। বলা বাহুল্য আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সেই সিদ্ধান্তটি আজও বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে বহাল আছে। সমগ্র রিপোর্টটি তিনি তাঁর নতুন কর্মকর্তা ওয়াগ সাহেবের হাতে তুলে দেন।

ওয়াগ সাহেব সমগ্র রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করে রাধানাথ শিকদারের কর্মদক্ষতায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর এই কাজের ফলস্বরূপ (G.T.S.-1818) প্রধান কর্নেল ওয়াগ সাহেব রাধানাথ শিকদারের বিস্ময়কর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে রিপোর্ট পাঠান লন্ডনের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। বলাবাহুল্য, সে যুগে বড়ো বড়ো পদে নিয়োগপত্র নিয়ে যারা ভারতের কলকাতায় এসে নানা পদে যোগ দিতেন তাদের ৯৯ ভাগই ছিলেন আদতে ঔপনিবেশিক মানসিকতার। তারা এই কৃতিত্বের সম্মান রাধানাথকে দিতে চাইলেন না। তাঁর কৃতিত্ব অন্তরালেই রয়ে গেল। এক্ষেত্রে যে দুজনকে নিয়ে আলোচনা করছি তাদের একজন ভারতীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, অন্যজন অ্যান্ড্রুজ ওয়াগ সাহেব ছিলেন অভারতীয়, বিদেশাগত শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন। তিনি তাঁর ভাব অনুযায়ী ভারতীয় মাত্রই ভিখারি, সাপুড়ে, ঝাঁড়ফুক করা মানুষদের প্রতিনিধি রাধানাথের এই সাফল্য কিছুতেই মেনে নিতে না পেরে তিনি হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের নামকরণ করলেন G.T.S.–1818-এর পূর্বতন আধিকারিক কর্নেল জর্জ এভারেস্ট সাহেবের নামে। তাই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারক ও তার নামকরণ হলো মাউন্ট এভারেস্ট নামে। আজও জগৎবাসী রাধানাথ শিকদারের আমানুষিক পরিশ্রম করাকে কর্নেল জর্জ এভারেস্টের কাজ বলেই জানে। কিন্তু হাতে কলমে একাজের সম্পূর্ণ কারিগর রাধানাথ শিকদার একেবারেই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন। আজ আর কোনো উপায়ই নেই এই অসত্যকে সত্য পরিণত করার। কারণ বিশ্ব সভায় ভারতের এই সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই।

একই ঘটনা বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। জগদীশচন্দ্র বসুর নাম আড়াল করে মার্কনি সাহেব কৃতিত্বটা হস্তগত করেছিলেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি বাস করতে শুরু করেন তখনকার ফরাসি অধিকৃত চন্দনগরে। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করলেন সাহিত্য সাধনায়। তখনকার দিনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং তিনি দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থাকায় বাংলাভাষা বলতে পারলেও সচ্ছল ভাবে লিখতে পারতেন না।

সে যুগে প্রচলিত বিদ্যাসাগরীয় বাংলা ভাষার প্রতি রাধানাথ বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাই গুরুগম্ভীর বাংলাভাষা অপেক্ষা সমসাময়িক প্যারীচাঁদ মিত্রের চলতি ভাষাকে মান্যতা দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হন। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত (ছদ্মনাম-টেঁকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরে দুলাল' বইটি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। কারণ তিনি মোটেই আলালের ঘরে দুলাল ছিলেন না। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম ছিল— 'মাসিক পত্রিকা', প্রথম প্রকাশ ১৬ আগস্ট ১৮৫৪)। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় কলম ধরে তখনকার গ্রামবাসী ও কলকাতাবাসী বাঙ্গালির মনের গহিনে বদ্ধমূল হয়ে থাকা নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করেন। তিনি বিদ্যাসাগরীয় বাংলা ভাষার বিরোধী থাকলেও বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক কাজের সমর্থক ছিলেন।

১৭ মে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ অমৃতলোকের যাত্রী হন। তবে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, সেই যুগের এমন কৃতী বাঙ্গালি স্বাধীন ভারতেও কেন্দ্র সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ অন্য রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে কোনো সম্মান পেলেন না। শুধুমাত্র গ্রেট ব্রিটোনো মেট্রিক্যাল সার্ভে রাধানাথ শিকদারের সম্মানে ভারতীয় ডাক বিভাগ তাঁর ছবি দিয়ে ডাকটিকিট চালু করেছিল ২০০৩ সালে। অতি সম্প্রতি ২০১৩ সালের মে মাসে উত্তর ২৪ পরগনার এক দরিদ্র বাঙ্গালি মেয়ে টুসি দাস দুর্গম হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট সফল ভাবে জয় করেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন এমন খবর ছবিসহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গালি দরিদ্র পরিবারের কন্যা টুসি দাস বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে এন সি সি-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রক ক্লাইম্বিং বিষয়ে হাতে কলমে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তারপর হিমালয়ের পাদদেশে রাজ্য উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত নেহরু ইন্সটিটিউট অব মাউন্ট টেনারিং থেকে সমস্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তারপরই শুরু হয় তাঁর পর্বত অভিযানের পালা। তিনি অভিযান করেন হিমাচল প্রদেশের মিনসোমা শৃঙ্গ যার উচ্চতা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট থেকে কিছু কম, ২০ হাজার ফুট (৬৪৪৩ মিটার)। এতে অতীব উৎসাহিত হয়ে ২০১৩ সালে অভিযান করেন মাউন্ট এভারেস্ট। এই অভিযান করতে খরচ হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। তা সংগৃহীত হয়েছিল ভারতের নানা পর্বত অভিযাত্রী দলের প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ও একক দানে। না, এভারেস্ট শৃঙ্গের সত্যিকারের আবিষ্কারক রাধানাথের মতো ভুল করেননি টুসি দাস। সফল পর্বত অভিযাত্রী টুসি দাস মাউন্ট এভারেস্ট শীর্ষে এই কাজে সহায়তা করা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম খোদিত করে এসেছেন বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে। যাতে পরবর্তী অভিযাত্রী দল তা দেখতে পান। ■

ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি একপাও ছেড়ে যাওনি

সারদা সরকার

লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের জন্মদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ৬ ফাল্গুন। ১২৯৮ সালের ৬ ফাল্গুন কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে কেওটা গ্রামে মামার বাড়িতে গঙ্গাতীরে তাঁর জন্ম। সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত পালন করছে এই মহাশুভক্ষণ। শ্রীভগবান যুগে যুগে আসেন, রক্ষা করেন, পালন করেন সৃষ্টি করেন— মহাপুরুষকে। কিছু শব্দচয়ন করে তা প্রকাশ করা যায় না। বেশ কয়েক জীবন লেগে যায় তাঁকে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করতে। তিনি অলৌকিক বা অতিমানব নন, আমাদের প্রাণের মানুষ, কাছের জন। অথচ অপার্থিব প্রেমময় করুণার অবতার। কঠোর আবার কোমল, রুক্ষ্ম নীরস শুকনো সাধুও যেমন, তেমনই আবার রসে বসে স্নিগ্ধ কৌতুকময় সহাস্য স্বাভাবিক ঘরোয়া নিবিড় প্রশান্তি।

তাঁর জন্মদিনে তাঁরই বাণীর মালা দিয়ে বরণ করে নেবার সময়।

• 'সংসার একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র— এতে নিত্য নতুন তরঙ্গ থাকবেই। যতদিন মানুষ দৃঢ়ভাবে ভগবদ আশ্রয় না করতে পারে ততদিন হাহাকার করে। ভগবদ আশ্রিত হলে সবটা শান্তিময় হয়ে যায়। কী রকম জানিস? যেমন নীলচশমা যে চোখে দেয়, সেসব নীল দেখে, তেমনি প্রেমাঞ্জন চোখে দিলে সবই আনন্দপূর্ণ হয়ে যায়'।

• 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইহ দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত-জনপ্রিয়ঃ'— ঈশ্বর ভক্তের অধীন, ভক্ত ভাগবানের হৃদয়ের ধন। ভক্ত যেমন রাখে তিনি তেমন থাকেন। ভক্ত যা বলে ডাকে তিনি তাই হয়ে যান। অহো, ভক্তের এত শক্তি। আমায় বলে দাও কেমন করে ভক্ত হতে পারি— বলে দাও; তুমিও সেই নাম কর। অনিবার সেই নাম কর'।

• 'নাম কল্পতরুমূলে ভোগ, মোক্ষ, যে যা চায় সে তাই পায়। নামকীর্তনে ভক্ত ভগবানেই লীন হয়। নামই ঈশ্বর, ঈশ্বরই নাম। হরেকৃষ্ণ নাম কর, রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্যই আনন্দরূপ ধরে তোর কাছে নৃত্য করতে থাকবে। আনন্দের মহাপ্লাবনে নশ্বর বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে'।

• 'শাস্ত্রে যে বলে নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়, সেটা ঠিকই। তবে বলতে পার, বুঝতে পারছি না— বোঝবার অধিকার চাই। ধর, গঙ্গাস্নানের সংকল্প করে স্নানের জন্য যাত্রা শুরু করলে— অমনি পাপক্ষয় হতে আরম্ভ হলো, যেমন তুলোর গাদায় আগুন দিলে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকে তেমনই নাম করলে পাপের ক্ষয়ও শুরু হয়ে যায়। শুধু যে নাম করে তারই পাপক্ষয় হয় তা নয়, যে নাম শোনে তারও পাপক্ষয় হয়। তখন সাত্ত্বিক পরমাণু নেমে আসে, সেখানকার বাতাস পবিত্র হয়ে যায়। এমনকী স্বয়ং যমও সেখানে আসতে ভয় পান। এই যে তোরা পরিবেশন করিস, তোদের ভাবশুদ্ধির অভাবেই বিরক্তি আসে। পরিবেশন করার সময় ইষ্টকে খাওয়াচ্ছিস মনে করে পরিবেশন করবি— তৃপ্ত করে খাওয়াতে হয়। মন্ত্রের দ্বারা যে নিবেদন হয় তাকে 'প্রসাদ' বলে আর দেবতা যখন স্বয়ং গ্রহণ করেন তখন সেটা হয়— 'মহাপ্রসাদ'। এই পরিবেশনে বিরক্তির ফলে প্রসাদেরও অবমাননা হয়ে যায়'।

• 'জগতের কতকগুলো জিনিস আছে বাইরে পবিত্র, অন্তরে অপবিত্র। আর কতকগুলি আছে অন্তরে পবিত্র বাইরে অপবিত্র। গন্ধদ্রব্য, উত্তম শয্যা, বসন-ভূষণ, উত্তম খাদ্যদ্রব্য— এসব বাইরে পবিত্র হলেও তার দ্বারা রজঃ তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, এজন্য অন্তরে অপবিত্র। সেরূপ উত্তম অট্টালিকা প্রভৃতি ইহলোকের সুখের উপকরণ যা কিছু সব অন্তরে অপবিত্র, কেননা তাতে কামনা বাড়ে। আর শ্মশান বাইরে অপবিত্র হলেও শ্মশান দেখলে মনের অপবিত্র ভাব দূর হয়ে যায়, কামনা বাসনা পলায়ন করে। শত শত তীর্থ ভ্রমণে যা না হয়, শ্মশানে কিছুদিন যদি মানুষ থাকে তাহলে তার সহস্রগুণ পুণ্য লাভ হয়। কামনা শূন্য হৃদয়ে মহাশক্তি উপস্থিত হয়। তাই শঙ্কর ভগবান ও কালীমাতা শ্মশানেই বাস করেন'।

• 'মানুষের দেহে ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই শ্মশান। সেই শ্মশানে অবস্থান করে মা আপন মনে নাচতে থাকেন, যাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, যারা মায়ের শরণাগত, খুব নাম করেছে, তারা সব সময় শুনতে পায়। যারা অনন্যশরণ নয়, তারা শুনতে পায় যখন জপ করে। আর যারা ডাকে না তাদের কাছে মা ঘুরিয়ে থাকেন। যারা অনুক্ষণ কেবল স্মরণ করে তাদের নিকট মা সদা জাগ্রত হয়ে গান গেয়ে তাদের কর্মক্ষয় ও বাসনা-নাশ করে দিয়ে বুকে তুলে নেন। নাম কর— কেবল নাম কর'। বল— কালী কালী কালী। সারা পৃথিবী জুড়ে ভক্তরা আজ ভক্তাধীন সীতারামের ধ্যানে বিভোর— ঠাকুর আজও রয়েছেন তাঁদের আগলে, প্রতিটি দুঃখ বিপদে, অহংকারে অবজ্ঞায়, ভালোবাসা ঘৃণায়, জনমে মরণে তারা আজও ঠাকুরের পদচিহ্ন দেখতে পায় জীবনের পরতে পরতে। একজন অকৃতি অধম সন্তানের চোখের জল আজ বুঝতে পারে 'ভাবি ছেড়ে গেছ ফিরে চেয়ে দেখি একপাও ছেড়ে যাওনি'।

(ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

অনামা সন্ন্যাসী

প্রবাল চক্রবর্তী

আকাশে সন্ধ্যের ছায়া ছায়া অস্তরাগ। তার কোলে এক অতি জাগতিক শিল্পী মস্ত বড়ো তুলি দিয়ে খামখেয়ালি আঁচড় কেটেছে। একবার আঁচড় কেটেছে, রঙটা পছন্দ হয়নি, সে রঙ ধেবেড়ে অন্য রঙ দিয়ে আরেকটা আঁচড় কেটেছে। রঙের মেলা খেলে বেড়াচ্ছে আকাশের নীচে, সরযূর জলে। নদীতীরে একলা বসেছিলেন দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসী। গেরুয়া চাদরে ঢাকা মুখ। বয়সের গাছপাথর নেই তাঁর। সরযূর মতোই সেই সন্ন্যাসীর মনের গহনেও চলছিল অনেক রঙের মেলা।

সন উনিশ শো বাহাত্তর এখন।

দূরে শ্মশানে চিতা জ্বলছে। কার চিতা কে জানে। পটপট শব্দে মরদেহ থেকে হুতাত্মা স্ফুলিঙ্গের রাশি ছিটকে উঠছে অন্ধকার আকাশের পানে। ত্রেতাযুগে এই শ্মশানেই রাজা দশরথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। সরযূর এই ঘাটেই জলসমাধি নিয়েছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। একদিন আমারও জলসমাধি হবে ওই ঘাটেই। অজ্ঞাত, অপরিচিত এক দেশভক্তর শেষযাত্রা। অনন্ত তেজঃপুঞ্জ থেকে এসেছিলাম, অনন্ত তেজঃপুঞ্জেই বিলীন হয়ে যাবো।

কে আমি? আমার কোনো নাম নেই। আমি একটা মৃত মানুষ। আই অ্যাম ইয়োর ডেড ম্যান। আমার একমাত্র পরিচয়, আমি ভারতমাতার সন্তান, দেশভক্ত। শয়নে জাগরণে সর্বক্ষণ ভারতমাতার মঙ্গলই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, আর কিছু নয়।

মৃত্যু আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। নিজের দুরারোগ্য ব্যাধির খবর রটিয়ে সরকার বাহাদুরের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে পালিয়েছিলাম। নাহলে অন্যদের মতো আমাকেও চালান করে দিতো আন্দামানে। সেলুলার জেলের কষ্ট বরণ করতে আপত্তি ছিল না। বরঞ্চ ওখানে থাকলে হয়তো বহু সতীর্থকে মগজধোলাই থেকে রক্ষা করতে পারতাম। কিংবা হয়তো পারতাম না। বিনায়ক আর মহারাজ তো সে চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিল। তাছাড়া, আমার সামনে তখন একটাই লক্ষ্য, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করা। বিনায়কের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বিনায়ক দেশের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। সেইসব যুবকরা প্রতীক্ষা করছে উপযুক্ত মুহূর্তের। সেই মুহূর্তটা আমাকে সৃষ্টি করতে হবে।

একদিকে আন্দামান, অন্যদিকে মণিপুর। আজাদ হিন্দ ফৌজ তো ভারতের চৌকাঠ অতিক্রম করে ফেলেছিল। এই সময় কংগ্রেস যদি সাহায্য করতো, দেশজোড়া একটা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতো, তাহলেই হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আমাদের লোকেরা সেই মুহূর্তেই বিদ্রোহ করতো। তাদের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের মধ্যে ঢুকে পড়তো। লং মার্চ করতো দিল্লির উদ্দেশ্যে। পথে প্রতিটি গ্রাম-শহর মুক্ত করতে করতে আর সমর্থন কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যেত। বিশাল কলেবর ধারণ করে দিল্লি

পৌঁছতো স্বাধীন ভারতীয় সেনা। আত্মসম্মানের সঙ্গে দেশ স্বাধীন হতো, আমাদের নিজেদের শর্তে। কিন্তু তা হলো না। দুর্ভাগ্যক্রমে একই সঙ্গে অক্ষশক্তির পরাজয় হলো। বাধ্য হয়েই কাজ অসমাপ্ত রেখে নিজের মৃত্যুর খবর রটাতে হলো আমাকে।

বাপু কেন আমাকে সমর্থন করলেন না? ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি পাপ? অহিংসার যুক্তিটা এখানে খাটে না। উনি চার্চিলকে সমর্থন জুগিয়েছেন, আমি হিটলারের সমর্থন নিয়েছি। চার্চিল না হিটলার, কে বড়ো নরঘাতক? কে বড়ো বর্ণবৈষম্যবাদী? দুজনের মধ্যে তফাত শুধু একটাই। হিটলার নরহত্যা চালিয়েছিল ইউরোপে, চার্চিল ভারতবর্ষে। বিশেষত আমার বাংলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরি করে। যেন আমরা পোকামাকড় বই আর কিছু নই! তাতে বাপুর কিছুই এলো গেলো না? শত্রুর শত্রু মিত্র, তার সহায়তা নেওয়াতে অন্যায় কোথায়? বাপু যে চার্চিলের মোট বইলেন, এতে আমার দেশের কী ছাই উপকার হলো?

যেদিন জাপান আত্মসমর্পণ করলো, সে রাতটা আমার কেটেছিল সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে, ধ্যানে। কী করবো এখন? কোথায় গেলে দেশের জন্য কিছু করতে পারবো? সেটাই ছিল চিন্তা। আমেরিকা, ব্রিটেন বা তাদের উপনিবেশ দেশগুলোতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। হার ম্যাজেস্টির এক নম্বর শত্রু আমি, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুন হতাম। অক্ষশক্তি ও তাদের অধীন দেশগুলো? জাপান, কোরিয়া বা তাইওয়ান? এরা তখন সদ্য-পরাজিত। এরকম কোনো দেশে পালিয়ে গেলে খুব শিগগিরই ধরা পড়ে যেতাম ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের হাতে।

ভারত? ব্রিটিশের অধীনে হলেও ভারতবর্ষের মানুষ আমাকে রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু দেশে কে শত্রু, কে মিত্র, সেটা জানবার উপায় ছিল না আমার কাছে। জওহর বলেছিল, দেশে ফিরলে আমার বিরুদ্ধে তরোয়াল ধরবে। কংগ্রেসে তখন ওরই রাজত্ব। অন্যদিকে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ততদিনে বামপন্থাকে গিলে খেয়েছে কমিউনিস্টরা। এই কমিউনিস্টরাই আমাকে 'তোজোর কুকুর' অপবাদ দিয়েছিল। দেশে ফিরে এলে সীমান্তেই আমাকে খুন করা হতো, গোপনে। তাই দেশে ফেরার পথ ছিল বন্ধ।

রাশিয়া। এই একটি দেশই ছিল, যেটা ব্রিটিশ আমেরিকানদের অধীনে নয়, যারা আমাকে আশ্রয় দিতে পারতো। ব্যাঙ্কক, সায়গন হয়ে তাইপেই। সেখান থেকে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়ায় চলে গিয়েছিলাম, তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনার খবর রটিয়ে। সে খবর শুনে অনেকেই বিশ্বাস করেনি। একই প্লেনে আমার সঙ্গেই ছিল হাবিবুর। ওর কিছুই হলো না, আর আমি এতটাই পুড়ে গেলাম যে, আমার মুখটাও চেনা গেল না? জেরার মুখে হাবিবুর এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি। আমতা আমতা করে বলেছিল, ও মোটা গরমজামা পরেছিল, তাই ওর আগুন লাগেনি। আমার আগুন লেগেছিল, কারণ আমি গরমজামা পরিনি। তাইওয়ানের শীত এমনই অদ্ভুত, যাতে হাবিবুরের মতো কাশ্মীরি যুবককে গরমজামা পরতে হয়, আর আমার মতো প্রৌঢ় বাঙ্গালিকে গরমজামা পরতে হয় না! তাছাড়া, উলের পোশাক কবে থেকে অগ্নি-নিরোধক হলো?

আশ্রয় নিলাম রাশিয়ায়। লোকে নাম দিল 'জেনারেল ডেথ'।

রাশিয়ায় তখন স্ট্যালিনের রাজত্ব। মতের অমিল হলেই লোকেরা বেমালুম উধাও হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনেই বেশ কিছু ভারতীয় সতীর্থকে সাইবেরিয়ার গুলাক জেলে চালান হয়ে যেতে বা মাঝরাতে খুন হতে দেখেছিলাম। আমাকেও তো পাঠানো হয়েছিল সাইবেরিয়ায়। সেখান থেকেই খবর পেয়েছিলাম, গত দু'শতাব্দীর স্বপ্ন শেষমেশ রূপ নিয়েছে। সেই ১৮৫৭-র পর থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর যে চেষ্টা চলছিল, রাসবিহারী বসু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে প্রচেষ্টায় সফল হয়েও সামান্য ভুলে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। যে সেনার ভরসায় রাজত্ব করতো ইংরেজ, সেই সেনাই আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে। রাজত্ব করবে কী করে? তার মানে, দেশ স্বাধীন হচ্ছে। তার সঙ্গে, রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে দেশ। ব্রিটিশ কি আর শেষ কামড় না দিয়ে 'গ্লোরিয়াস রিট্রিট' করবে? বাপুর ভুল নীতির ফল ফললো শেষ পর্যন্ত। বহুবার ওঁকে সাবধান করেছিলাম, শোনেননি। কারোর কথা উনি শোনেন না, এক জওহর ছাড়া। অথচ, এই পার্টিশনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, দেশের সাধারণ মুসলমানরা তাদের সাম্প্রদায়িক শক্তির দাস নয়। প্রয়োজন শুধু তাদের মুসলমান সত্তাটাকে সুড়সুড়ি না দিয়ে তাদের ভারতমায়ের সন্তান বলে ডাক দেওয়া। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের দৃশ্যগুলো, নোয়াখালির গণহত্যার ঘটনাগুলো আজও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। ইংরেজের ষড়যন্ত্র আর বাপুর অদূরদর্শিতা দুইয়ে মিলে মুঘল সলতনৎ ও তার বর্বরতার দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনলো!

তবু, কিছু ভালো তো হলো! দেশের অর্ধাংশ নতুন করে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে চলে গেল, তবু বাকি অর্ধাংশ তো স্বাধীন হলো। হাজার বছর বাদে সেটাই বা কম প্রাপ্তি কীসে?

কিন্তু স্বাধীনতার পর?

রাশিয়া-আমেরিকার মধ্যে শীতযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। এদিকে রাশিয়ার প্রভাব এসে পড়েছে হিমালয় পর্যন্ত, ওদিকে আমেরিকার প্রভাব বেড়ে চলেছে দূরপ্রাচ্যে। এই দুই এলাকার ঠিক মধ্যিখানে আছে ভারত। দুই বিপরীতমুখী বিশ্বশক্তির অন্তিম সংঘর্ষ কি তবে

ভারতের বুকে হবে? যদি হয়, তবে তা পরমাণু যুদ্ধের রূপ নেবে। ভারতবর্ষ দেশটাই রেণু রেণু হয়ে বিলীন হয়ে যাবে ভারত মহাসাগরে। জওহরের ক্ষমতা নেই সেই সর্বনাশ ঠেকানোর। আরও দেখলাম, নতুন এক মিত্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। যারা আমাদের আটশো বছর পরাধীন রেখেছিল, তাদের উত্তরসূরি পাকিস্তান। আর যারা আমাদের দুশো বছর পরাধীন রেখেছিল, তাদের উত্তরসূরি আমেরিকা। এই দুই শক্তি হাত মিলিয়েছে। স্বাধীন ভারত এদের অহংকারের গলার কাঁটা। শীতযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতকে ধ্বংস করবার কোনো চেষ্টাই বাকি রাখবে না এরা।

শীতযুদ্ধকে ভারতের সীমান্ত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার পন্থা ছিল, গোটা এশিয়া জুড়ে স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা। আমি স্তালিনকে গিয়ে বললাম, সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে আছে ভূতপূর্ব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সদস্যরা। একমাত্র আমিই তাদের সবাইকে চিনি। আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তাদের সাহায্যে আমি গোটা এশিয়াতেই ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তিকে নাস্তানাবুদ করে দেবো। স্তালিন রাজি হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। ছেচল্লিশে জওহরকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আমি রাশিয়ায় আছি। সেই চিঠি জওহর তুলে দিয়েছিল মাউন্টব্যাটেনের হাতে। ইংরেজ সরকার জানতো, আমি কোথায় রয়েছি। আমাকে ছেড়ে দিলে সে খবর পৌঁছে যেত রাশিয়ার বাইরে। খাতায় কলমে সোভিয়েত তখনও মিত্রশক্তির অঙ্গ। আর আমি মিত্রশক্তির প্রধান শত্রু। হার ম্যাজেস্টি'স মেইন এনিমি। তাই আরেকবার আমাকে মরতে হলো। জেনারেল ডেথের মৃত্যুর খবর নথিভুক্ত হলো সাইবেরিয়ার।

এরপর দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটলো।

জেনারেল ডেথের নতুন নাম হলো, জেনারেল শিব। তাকে দেখা গেল চীনের রণাঙ্গনে। চিয়াং কাই শেকের মাধ্যমে চীনে প্রভাব বিস্তার করছিল আমেরিকা। তাই আমি মদত দিলাম মাও-কে। আমেরিকা বিরোধী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে চীন আত্মপ্রকাশ করলো। মাওয়ের মতো নরপশুকে মদত দেওয়া কি ভুল হয়েছিল? কিন্তু এরকম ভুল তো আমি বহুবার করেছি। কংগ্রেসের মধ্যে জওহরকে মদত দেওয়া, সেটাও তো ভুল হয়েছিল। অনেক সময়েই পছন্দটা ভালো আর খারাপের মধ্যে নয়, আমার দেশের জন্য সেই মুহূর্তে কে বেশি খারাপ আর কে কম খারাপ তার মধ্যে হয়। সেটাই করবার চেষ্টা করেছি সারাজীবন। মাওয়ের মতলব ছিল গোটা এশিয়ার দখল নেবে। তিব্বতে ওকে আটকাতে পারিনি, কিন্তু ভিয়েতনামে আটকেছিলাম। কাজটা কঠিন ছিল। একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে চীন। হো-কে বলেছিলাম, মাওকে বিশ্বাস না করতে, উত্তর সীমান্ত অরক্ষিত না রাখতে। আর বলেছিলাম, যত আফিম চাষ হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তে ফেলে রাখতে। তাই করেছিল ও। পরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিজেদের হারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমেরিকানরা জানতে পেরেছিল, ওদের সৈন্যদের বিরাট অংশ নেশাগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। মাও আমার সাহায্যের মর্যাদা রাখেনি, কিন্তু হো রেখেছিল। আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে ভিয়েতনাম ভারতের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠবে।

বেদান্তে 'অহং' বলে একটা ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'আইডেন্টিটি'। একটা মানুষ নিজেকে কী বলে বিশ্বাস করে, তার ওপরেই নির্ভর করে তার জীবন, তার কীর্তি। এই আইডেন্টিটিবোধের সূক্ষ্ম পরিবর্তন এক লহমায় একজন দেশপ্রেমীকে দেশদ্রোহীতে রূপান্তরিত করতে পারে। হাবিবুর ছিল আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী। যতদিন ও নিজেকে ভারতমায়ের সন্তান হিসেবে দেখতো, ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে তৈরি ছিল ও। সেই হাবিবুর আমার অনুপস্থিতিতে বোধহয় মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি হিসেবে ভাবতে লাগলো নিজেকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো ষড়যন্ত্রের হোতা হয়ে দাঁড়ালো ও। আমার হাতে গড়া হাবিবুর, সমরবিদ্যার যাবতীয় শিক্ষা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। সেই বিদ্যা ও ব্যবহার করলো আমারই দেশের বিরুদ্ধে! ও কি জওহরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসব করলো? যেমন শরৎ ভেবেছিল, জওহরকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নেবার চেয়ে বরং বাংলাকে ভারত থেকে আলাদা করা শ্রেয়? সেই কারণেই কি, যে মহারাজ সারা জীবনটা দেশের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছিল, স্বাধীনতার পর সে ভারত থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানে? ভুল, মস্ত ভুল। সবার ওপরে দেশমাতৃকা, তার ওপরে আর কিছু নেই। সেটাই আমাদের একমাত্র অহং, আমাদের আইডেন্টিটি।

১৯৪৭ আর ১৯৬৫, দুটো আক্রমণেরই ব্যাটল-প্ল্যান ছিল হাবিবুরের। সাতচল্লিশে তো শুধু জল মাপা হয়েছিল। পঁয়ষট্টির পরিকল্পনা ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। ভারতকে হাতে ও ভাতে, যুদ্ধে ও কূটনীতিতে— সবদিক দিয়ে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিল দুই মিত্রশক্তি। দেশটাকে আবার পরাধীন বানাবার নিখুঁত ব্যবস্থা ছিল সেটা। শাস্ত্রীর বদলে জওহর থাকলে সেই পরিকল্পনা হয়তো সফল হয়ে যেতো। তার ওপর চীনের ভারত আক্রমণে শাপে বর হয়েছিল। অহিংসা ঝেড়ে ফেলে ভারতীয় সেনা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি, বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধ করেছিল ভারতের সেনা। লড়াইয়ের ময়দানে ব্যর্থ হয়ে শত্রুপক্ষ প্ল্যান করেছিল, দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রীর ওপর চরম মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এমন চুক্তিতে সই করাবে ওকে দিয়ে, যাতে নতুন করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় আমার দেশ। তাসখন্দ আমার খাস এলাকা, তাই সমঝোতাটা তাসখন্দে হওয়া জরুরি ছিল। যাতে বিপরীত পক্ষের

সব খবর আমি পাই, আর সেটা শাস্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারি। প্রতিপক্ষের সব ষড়যন্ত্র সেদিন বানচাল করে দিয়েছিলাম আমরা দু'জন মিলে। দুঃখ এটাই, শাস্ত্রীকে বাঁচাতে পারিনি। রাঁধুনি ওকে বিষ দেবে, এই পরিকল্পনার কোনো আগাম খবর পাইনি। পেলে শাস্ত্রী আজও বেঁচে থাকতো।

হাবিবুরের ভোলবদল আর জওহরের বিশ্বাসঘাতকতা একটা শিক্ষা দিয়েছিল আমাকে। যে কেউই ভারতের স্বাধীনতার শত্রু হয়ে উঠতে পারে, যদি ভারতবাসী স্বেচ্ছায় পরাধীনতা বরণ করে নেয়। সেই সময় থেকেই ঘন ঘন দেশে আসা শুরু করলাম। সাবধানে চলাফেরা করতে হতো, কারণ তখনও পুলিশ আমাকে খুঁজছে। হায়রে স্বাধীনতা! আমার চেনাজানা প্রতিটি লোকের ওপর নিয়মিত নজরদারি করতো স্বাধীন ভারতের পুলিশ, আর সেই খবর পৌঁছে দিত দিল্লিতে বসে থাকা ব্রিটিশ সরকারের এক গুপ্তচরকে, যার গলাভরা নাম দেওয়া হয়েছিল 'সিকিউরিটি লিয়াজোঁ অফিসার'। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে জওহর নিজে এই ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, ওর মৃত্যুর পরেও বহাল ছিল সে ব্যবস্থা। দেশে ফিরে প্রথমেই গিয়েছিলাম কলকাতায়। এলগিন রোডের বাড়িটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কারোর সঙ্গে দেখা করিনি, জানাজানি হয়ে যেত তাহলে। সেখান থেকে হাওড়া স্টেশনে গেলাম, ট্রেন ধরলাম নাগপুরের।

এর ক'বছর পর পূর্বসীমান্ত পার হয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম মহারাজের সঙ্গে। পাকিস্তানি সেনার হাতে সেখানকার মানুষের অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম। তখনই আমি আর মহারাজ মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে। সেই স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত এলো গত বছর। দুঃখ এটুকুই, মহারাজ সে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলো না।

ভবিষ্যতে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের কী হবে? সে স্বাধীনতা কি রক্ষা পাবে? নাঃ, চিকিৎসা গোড়ায় গিয়ে করতে হবে।

একটা চিঠি এসেছে আজ। চিঠিটাতে মাধব আমাকে লিখেছে; 'পূজ্যপাদ শ্রীমান স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ, পঁচিশে আগস্ট থেকে দোসরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনার লেখা সবকটি চিঠিই আমি পেয়েছি। চিঠিগুলো আমার কাছে পৌঁছলো গত ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তারিখে। আপনি যে তিনটি স্থানের কথা জানিয়েছেন, আমি সেগুলোর সন্ধান করবো। যদি এর মধ্যে একটি স্থানকে আপনি চিহ্নিত করে দিতে পারেন, তাহলে আমার কাজ নিশ্চিতরূপে কিছুটা সরল হবে। যে উদ্বেগ ও চিন্তাগুলো সর্বক্ষণ আপনার মনে আলোড়িত হচ্ছে, সেগুলো আমাকে শক্তি জোগায়। আমি নিশ্চিত, সেগুলো একদিন আমাদের সব সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে।'

চিঠিটা হেঁয়ালিতে লেখা, যাতে অন্য কারোর হাতে পড়লে সে কিছু বুঝতে না পারে। এটার একটা উত্তর আজ কালের মধ্যেই লিখে পাঠাতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আটকে রয়েছে এর জন্য। কেশব যে কাজ ১৯২৫-এ শুরু করেছিল, আজ সে কাজ দেশজুড়ে ডালপালা মেলেছে। আমি নিশ্চিত, মাধবের নেতৃত্বে সেই কাজ তার ধ্যেয়প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলবে শনৈঃ শনৈঃ। ভারতের স্বাধীনতা হবে নিষ্কণ্টক। মা আদ্যাশক্তির কাছে আজ আর এর বেশি কিছু চাওয়ার নেই আমার। হ্যাঁ, শেষযাত্রার আগে আর একটা জিনিস ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইবো মায়ের কাছে। আমার কথা না জানলেও চলবে দেশবাসীর, কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বীকৃতি যদি দেয় ভবিষ্যৎ ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী, তাহলে ভালো লাগবে আমার।

অনেক কাজ বাকি আছে আজও। শেষযাত্রার আগে সেগুলোকে সম্পন্ন করতে হবে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়বে দ্য ডেড ম্যান। লোকে ভাববে, মরা লোকটা কি আবার নতুন করে মরলো, নাকি আগের মতো আবার সবাইকে ঠকিয়ে দিয়ে নতুন কোনো অভিযানে বেরোলো?

সূর্যদেব টুপ করে ডুব দিলেন সরযূর জলে। অমানিশা ঘনিয়ে এলো চরাচরে। উড়ো চিন্তাগুলোকে একধারে সরিয়ে রেখে ধ্যানাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী আঁধার গলির দিকে। তারপর মিশে গেলেন জনারণ্যে।

পরিশিষ্ট

দীর্ঘ সাত দশক পর ২০১৮ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম স্বীকৃতি পায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজাদ হিন্দ দিবসে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগ্রহালয়কে স্থান দেন ভারতের মিলিটারি ওয়ার মেমোরিয়ালের মধ্যে। একই বছর নেতাজীর আরেকটি অতৃপ্ত ইচ্ছা পূরণ করেন মোদী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দুটি দ্বীপকে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ নাম দিয়ে। আন্দামানের ন্যাভাল কম্যান্ডের হেডকোয়ার্টার যে দ্বীপে, তার নামকরণ হয় নেতাজীর নামে।

অনামা সেই সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র সবই রাখা আছে অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহালয়ে। তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লেটারহেডে লেখা সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের চিঠিটাও রয়েছে। ওই দুই মহামানব মিলে সেদিন কী পরিকল্পনা করেছিলেন, তা আজও অজ্ঞাত। কী সেই তিনটি জায়গা, যার একটিকে সন্ন্যাসী চিহ্নিত করেছিলেন? পরবর্তী দশকগুলোর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তার কি কোনো যোগাযোগ রয়েছে? কোন এমন স্থান আছে ভারতে, যার উপস্থিতি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে? মা সরযূ নিশ্চয়ই জানেন। ■

স্নানে শরীর ও মন দুইই শুদ্ধ হয়

অসিতবরণ আইচ

● সকালে সূর্যোদয়ের আগেই স্নান সর্বোত্তম।

● ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ভালো।

● অবগাহন স্নান অর্থাৎ নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্নান করা সবচেয়ে ভালো।

● স্নানের আগে সরষের তেল ভালো করে সর্বাঙ্গে মালিশ করে নিতে হবে।

● গ্রাষ্মকালে ঘর্মাক্ত শরীরে তেল মাখতে অসুবিধা হলে আগে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে নিয়ে তেল মাখতে হবে।

● তেলের সঙ্গে ২/১ ফোঁটা জল মিশিয়ে নিলে সহজে শরীরে মালিশ করা যাবে।

● গায়ে জল ঢালার আগে অল্প জল মাথার তালুতে দিয়ে নিতে হয়।

● সময় বা তেল কম থাকলে নাকে, নাভিতে, মূত্র ও মলদ্বারে পায়ের তলায় অবশ্যই তেল দিতে হবে।

● যারা বাত ও শ্লেষ্মা রুগী তারা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করবেন।

● শীতকালে ঠাণ্ডার কারণে গরম জল মিশিয়ে স্নান করলে, শেষে একটু ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে।

● স্নানান্তে সুতির বস্ত্র পরা উচিত।

● পাওয়ার বা ঝরনার স্নান করা হার্টের পক্ষে ভালো নয়।

● ভেজা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে শরীর মর্দন করে স্নান করতে হবে।

● স্নান শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম ও শুদ্ধিকরণ।

● কথায় বলে— বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞানে/চিত্ত শুদ্ধ ধ্যানে/অর্থ শুদ্ধ দানে/দেহ শুদ্ধ স্নানে।

● পুকুরে খালে বিলে নদীতে নোংরা জলের চেয়ে বাড়িতে স্বচ্ছ জলে স্নান করা শতগুণে ভালো।

● স্নান করার সময় মুখ ভর্তি জল নিয়ে চোখে জল ঝাপটা দিন চোখ খোলা রেখে।

● যতক্ষণ স্নান করবো ততক্ষণ মুখ ভর্তি জল রাখা ভালো।

● স্নানের সময় নাভিতে ও মলদ্বারে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে।

● ভিজে গামছা দিয়ে দুই কুঁচকি বরাবর দুই হাতে টেনে টেনে রগড়ে দিতে হবে। হার্নিয়া হবে না।

● স্নানের আগে জল শুদ্ধ করে নিতে হবে শুদ্ধি মন্ত্রের দ্বারা। সংক্ষেপে জলস্পর্শ করে 'ওম্ গঙ্গা' বলে নেওয়া।

● যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তাঁরা তেল মাখা ও গামছা দিয়ে রগড়ানোর সময় হার্টের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে টানবেন না।

● যাঁরা নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন তাঁরা তেলমাখা ও গামছা দিয়ে রগড়ানোর সময় নীচের দিকে টানবেন না।

● শিশু ও রুগীদের পক্ষে রৌদ্রতপ্ত জল স্নানের পক্ষে ভালো।

● নিমপাতা, কাঁচা হলুদ, কাঁচা বা শুকনো তেজপাতা, নিশিন্দা পাতা সেদ্ধ করা জলে স্নান করা যায়।

● কর্পূর বা ফিটকিরি দেওয়া জলেও স্নান করা যায়। (যেন চোখে না লাগে)।

● রাজ জাগার পরে অতি অবশ্যই স্নান করতে হবে সকালে।

● স্নান খাওয়ার আগেই করতে হবে। খেয়ে স্নান করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। স্নান ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

● গরম জল মাথায় ঢালা সর্বতোভাবে নিষেধ।

● স্নান মানেই নতুন শক্তি, স্নান মানে ক্লান্তি দূর।

● জ্বরে অতি দুর্বলতায় যক্ষ্মারোগে রক্তাল্পতায় স্নান না করে গা মুছে নিতে হবে। শ্রান্তি-ক্লান্তি, ঘাম সহ স্নান নিষিদ্ধ। ■

পুরাণকথা

কচের সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ

বহু যুগ আগে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। অসুররা কখনো স্বর্গরাজ্য দখল করে নিলে দেবতারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে অসুরদের তাড়িয়ে দিত। একবার এরকম যুদ্ধে দেবতারা লক্ষ্য করল, আগের দিন যে অসুররা মারা পড়েছিল পরদিন তারাই আবার নতুন উৎসাহে যুদ্ধ করছে। কারণ অনুসন্ধান করে দেবতারা জানতে পারলেন দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে তাদের পুনরায় জীবিত করে দেন।

দেবতারা মহা চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা দল বেধে তাঁদের গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বললেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন, অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন। সেই বিদ্যার প্রভাবে দৈত্যরা মারা পড়লেও জীবিত হয়ে পড়ে। দেবতাদের মধ্যে কেউ যদি কৌশলে সেই বিদ্যা শিখে আসতে পারে তাহলে শুক্রাচার্যের মন্ত্র প্রভাবহীন হয়ে পড়বে। তাহলে অসুররা পুনরায় জীবিত হতে পারবে না।

বহু চিন্তাভাবনা করে দেবতারা শেষমেশ গুরু বৃহস্পতির পুত্র কচকে রাজি করালেন। কচ অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র ও গুণী। দেবতারা বললেন— কচ, স্বর্গরাজ্যের বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তুমি শুক্রাচার্যের শিষ্য হয়ে কৌশলে সঞ্জীবনীবিদ্য শিখে এসে দেবতাদের সম্মান রক্ষা কর। কচ পিতা বৃহস্পতি ও দেবতাদের প্রণাম করে শুক্রাচার্যের আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেদিন নিজের কুটিরে বসে অসুরদের কথাই ভাবছিলেন শুক্রাচার্য। হঠাৎ সুন্দর একটি ছেলেকে দেখে তিনি খুশি হলেন। প্রণাম করে পরিচয় দিয়ে কচ বললেন— ভগবন্, আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি। পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে শুক্রাচার্য বললেন— বেশ, তাহলে আমার কাছে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকো আর আশ্রমের সব কাজ কর। কচ সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন।

কচ খুব মন দিয়ে শুক্রাচার্যের সব আদেশ পালন করতে লাগলেন। কারণ তাঁকে তো সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে নিতে হবে। তাই সমস্ত কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানীরও সব আদেশ পালন করতে লাগলেন। দেবযানী শুক্রাচার্যের একমাত্র মেয়ে। মেয়ের সব আবদার পূরণ করেন তিনি। দেবযানী কচের ওপর খুশি, তাই শুক্রাচার্যও কচের উপর খুশি থাকতেন।

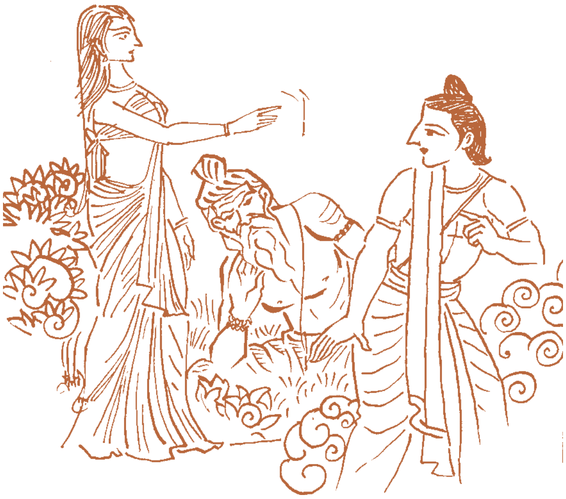

শুক্রাচার্য ও দেবযানী কচের উপর খুশি থাকলে কী হবে, অসুরেরা কচের তাদের গুরুদেবের শিষ্য হওয়াটা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। তারা টের পেয়েছিল কোনোভাবে সঞ্জীবনী বিদ্যার রহস্য জানতেই কচ এখানে এসেছে। তাই অসুররা তক্কে তক্কে থাকত সুযোগ পেলেই কচকে মেরে ফেলতে হবে।

একদিন কচ আশ্রমের গোরুগুলি নিয়ে চরাতে গেছেন। বনের মধ্যে অসুররা কচকে ধরে মেরে ফেলে কুচি কুচি করে কেটে শেয়াল-কুকুরদের খাইয়ে দিল। সন্ধ্যায় কচ ফিরে এল না দেখে দেবযানী বাবার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। শুক্রাচার্য ধ্যানে সব জানতে পারলেন। তিনি মন্ত্রের প্রভাবে কচকে জীবিত করে ফিরিয়ে আনলেন। এরকম বেশ কয়েকবার হলো। প্রতিবারই শুক্রাচার্য দেবযানীর আবদার মেনে কচকে জীবিত করে দেন।

অসুররা এবার কঠিন ফন্দি আঁটল। তারা বনের মধ্যে কচকে মেরে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে সরবতের সঙ্গে তাদের গুরুদেবকে খাইয়ে দিল। কচ সন্ধ্যেবেলা না ফিরলে আগের মতোই দেবযানী কেঁদেকেটে অস্থির হলো। শুক্রাচার্য ধ্যানে দেখলেন এবার কচ তাঁর পেটের মধ্যে রয়েছে। মেয়েকে তিনি বললেন কচকে বাঁচালে তিনি নিজেই মারা পড়বেন। কেননা কচ তাঁর পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে। দেবযানী আবদার ধরলেন, আগে কচকে মন্ত্র শিখিয়ে দাও, কচ বেরিয়ে এসে তোমাকে জীবিত করবে। শেষে তাই হলো। কচ শুক্রাচার্যের পেটের মধ্যেই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে বেরিয়ে এসে শুক্রাচার্যকে জীবিত করলেন।

কচের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। তারপর একদিন গুরুকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে চাইলেন। শুক্রাচার্য খুশি মনে তাঁকে আশীর্বাদ করে ঘরে ফেরার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু দেবযানী কচকে অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি হলো না। দেবযানীর ইচ্ছা ছিল কচকে বিয়ে করে এখানেই রেখে দেবে। সব শুনে কচ বললেন, এ হয় না দেবযানী, তুমি আমার গুরুকন্যা। সেই হিসেবে তুমি আমার বোন। সভ্য সমাজে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না। দেবযানী কচের কথায় এতটুকুও শান্ত হলো না। ভয়ানক রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন, তুমি ছল করে যে বিদ্যা শিখলে তা কখনো কাজে লাগাতে পারবে না। কচ বললেন, 'তোমার অন্যায় অভিশাপে আমার কোনো ক্ষতি হবে না, আমি এই মন্ত্র যাকে যাকে শেখাব তারা কাজে লাগাতে পারবে এই বিদ্যা। আর বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে বিয়ে করার জন্য এখানে আসিনি, আমার দেবকুলকে রক্ষা করার মন্ত্র শিখতে এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। আমি চললাম।' কচ স্বর্গরাজ্যে ফিরে এলেন। দেবতারা তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

মৌ দাশগুপ্ত

ভারতের পথে পথে

পুনে

মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ৫৫৯ মিটার উঁচু মালভূমিতে ছবির মতো শহর পুনে। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান রূপে যেমন এই শহরের খ্যাতি, তেমনই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ও পেশোয়া বাজীরাওয়ের স্মৃতি বিজরিত। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের হাতে গড়া এই শহরকে দাক্ষিণাত্যের রানি বলা হয়। প্রাচীনকালের পুণ্যপুর কিংবা অসুররাজের পুণ্যেশ্বর থেকে পুনা নামকরণ হয়েছে। এখানে রয়েছে মরাঠাশৈলীতে তৈরি পার্বতী মন্দির, গণপতি মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, ভবানী মন্দির ও সূর্য মন্দির। রয়েছে ৩০ একর জুড়ে পেশোয়া উদ্যান। উদ্যানের মাঝে রয়েছে সপ্তদশ শতকের কারুকার্যময় চতুর্ভুজ গণপতি মন্দির। কাছে রয়েছে লালমহল, পাতালেশ্বর গুহা। ২৪ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সিংহগড়। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের অনাগোনা সারাবছর লেগেই থাকে।

জানো কি?

- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মি. ১৯ সে.
- পৃথিবীতে চাঁদের আলো আসতে সময় লাগে ১.৩ সেকেন্ড।
- পৃথিবীর বার্ষিক গতিবেগ ৩০ কিমি প্রতি সেকেন্ড।
- পৃথিবী ২০ কিমি প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে প্রতি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।
- নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে ঋতুবৈচিত্র্য দেখা যায় না।
- সূর্য ছাড়া পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেনটিউরি।

ভালো কথা

অন্য ভাবে চড়ুইভাতি

২৫ ডিসেম্বর আমরা গৌড়ে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। খুব আনন্দ করেই বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত লোক চড়ুইভাতি করতে এসেছে যে মনে হচ্ছিল যেন মেলা বসেছে। মাইকের চিৎকারে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আর চারদিকে খুব নোংরা। মা, কাকিমণি, পিসিমণিরা টিফিন করার পর রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাকু আমাদের বলল চল আমরা অন্যভাবে চড়ুইভাতিটা উপভোগ করি। কাকুই আমাদের শিখিয়ে দিল। তারপর আমরা এক একটা চড়ুইভাতির দলে গিয়ে পরিচয় করলাম। দিশাদিদি খুব মিষ্টি করে বলল যাবার সময় সব আবর্জনা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে দিয়ে যাবেন। আর এরপর থেকে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের কিছু ব্যবহার করবেন না। ছোটোমতো ভাষণ আর কি! দু'ঘণ্টা ধরে আমরা ৩২ টা দলকে একই কথা বললাম। আমার খুব ভালো লাগল যে কেউ রিঅ্যাক্ট করল না। সবাই বলল আপনাদের আইডিয়াটা খুব ভালো। ফেরার সময় কাকুর এই অভিনব আইডিয়াটা শুনে পিসিমণি বলল আমরাও তো তোমাদের সঙ্গে যেতে পারতাম। ভাই বলল তাহলে রান্না করত কে?

সায়ন্তনী ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণী, গৌড়রোড, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) কা ণি র ক

(২) ল র ম ক্ত

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ণ ব্য চা ভি র প য় রা

(২) য় পে হ্য লে ষ্য চো র্ব্য চ

৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) ধারকবাহক (২) নাসিকাগর্জন

৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পরীক্ষানিরীক্ষা (২) বিচ্ছেদবেদনা

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান (৩) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (৪) আদৃতা দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১০।।

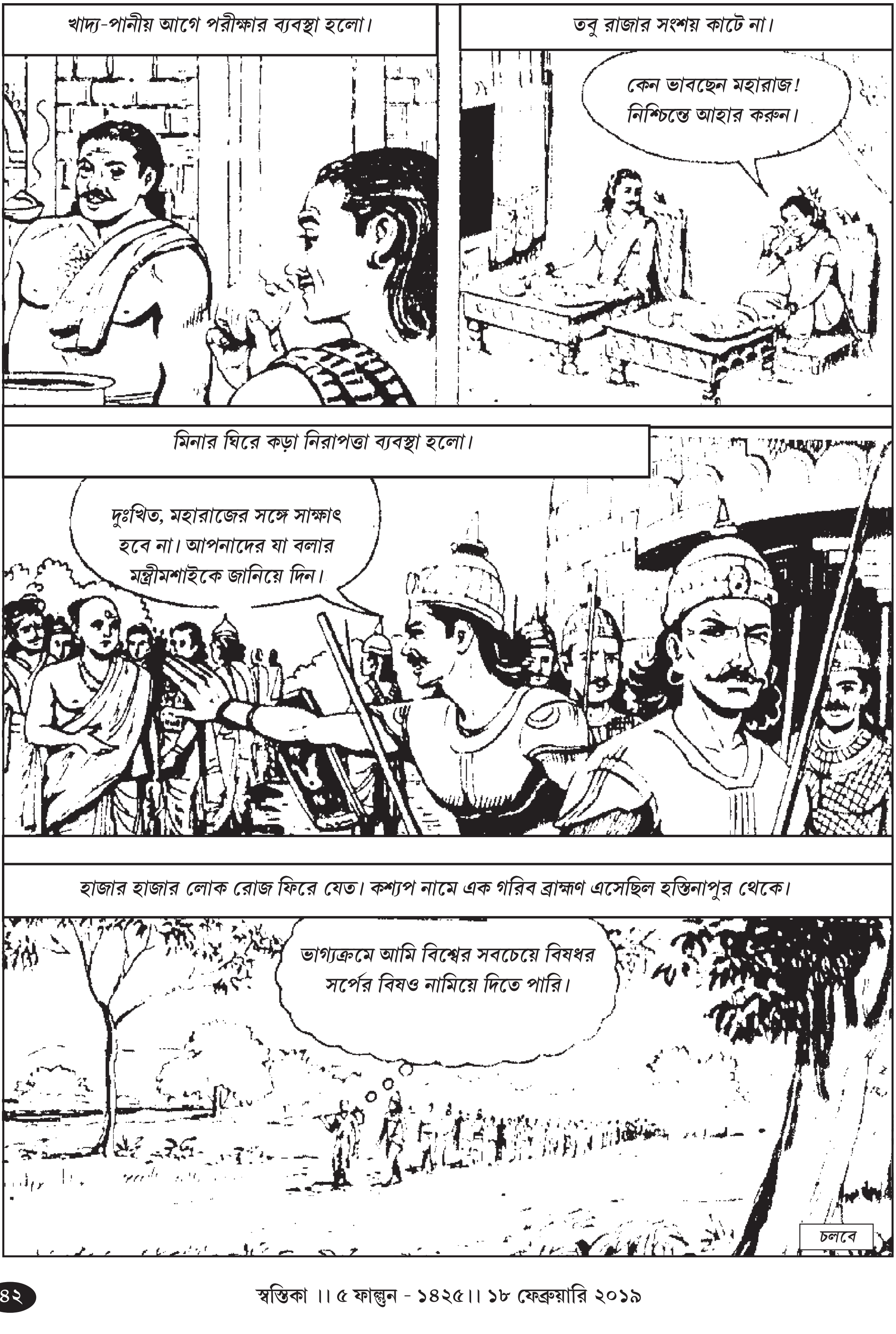

এবারের বাজেট জাতীয় অর্থনীতিতে দিনবদলের দিক্‌নির্দেশক

অম্লানকুসুম ঘোষ

অনেক সময় কোনও কোনও বিষয় নিজগুণে নিজ কক্ষপথের বাইরেও প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে ওঠে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটও সেইরকম। কেন্দ্রীয় বাজেট বরাবরই অর্থনীতি জগতের আলোচ্য ও বিচার্য। কিন্তু এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রথম থেকেই অর্থনীতির চেয়ে বেশি রাজনীতি জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। স্বঘোষিত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য ছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘোষণার মাধ্যমে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাজেট পেশের পর তাই খতিয়ে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করে সত্যিই এই বাজেট রাজনীতিমুখী হয়েছে, না নির্ভেজাল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভই এই বাজেটের অভিমুখ।

ভারতবর্ষ এক কল্যাণরাষ্ট্র। কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের অন্যতম লক্ষ্য রাষ্ট্রের দরিদ্র এবং প্রান্তিকতম মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্যি যে এতদিন স্বাধীনতার সাড়ে ছয় দশক পরেও দেশের দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য তেমন কিছুই করা হয়নি। সরকারের বার্ষিক বাজেট তাদের কথাই মাথায় রাখতো যারা কোনও না কোনও ভাবে সংগঠিত এবং ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে আকর্ষণীয়। বর্তমান বাজেটে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য পেনশন যোজনা আনা হয়েছে। এই যোজনা অনেকটা প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল (Contributory Provident Fund)-এর মতো। এই যোজনা অনুযায়ী যে কোনও শ্রমিক মাসে মাসে সামান্য কিছু অর্থ জমা করে গেলে সরকারও মাসে মাসে সেই ব্যক্তির নামে সমপরিমাণ অর্থ জমা করে যাবে। সেই ব্যক্তি ষাটোর্ধ্ব হওয়ার পর মাসে মাসে ৩০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। মাসে মাসে জমা করা অর্থের পরিমাণ ব্যক্তি যে বয়সে প্রকল্পে যোগ দিচ্ছেন সেই বয়সের ওপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ কম বয়সে প্রকল্পে যোগ দিলে যেহেতু ষাট বছর পর্যন্ত বেশিদিন ধরে টাকা জমা পড়ছে তাই মাসে মাসে জমা করা অর্থের পরিমাণও কম থাকছে। আর বেশি বয়সে প্রকল্পে যোগ দিলে মাসে মাসে জমা করা অর্থের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ম অনুযায়ী ঊনত্রিশ বছর বয়সে কেউ যদি এই প্রকল্পে যোগ দেয় তাহলে মাসে মাসে মাত্র একশো টাকা করে জমা করলেই তিনি ষাটোর্ধ্ব অবস্থায় মাসিক ৩০০০ টাকা পেনশন পাবেন। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন দুটি বিষয়ে, (১) নিয়মিত কাজের সুযোগ, (২) বৃদ্ধ বয়সের অর্থনৈতিক সুরক্ষা। গত পাঁচ বছরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'মুদ্রাযোজনা' ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কিছুটা হলেও বেড়েছে। এখন বর্তমান বাজেটে ঘোষিত পেনশন যোজনা তাদের বৃদ্ধ বয়সের অর্থনৈতিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করলো। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জীবনে যেন এতদিনে এই প্রথম সত্যিকারের 'অচ্ছে দিন' এল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পেনশন যোজনা কিন্তু তাৎক্ষণিক সুবিধাপ্রদানকারী নয়, অর্থাৎ এখনই হাতে কিছু পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা এতে নেই। বরং এখন থেকে জমা করে ভবিষ্যতে পেনশন পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে এতে। ফলে ভোটের আগের বাজেটে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে ভোট কেনার অভিযোগ এক্ষেত্রে অন্তত ধোপে টিকলো না।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আয় সংক্রান্ত বৃদ্ধি সবসময় কপালে ভাঁজ ফেলে মালিক পক্ষের। কারণ অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক ভাবে সমৃদ্ধতর হয়ে অসংগঠিত শ্রমিকরা মজুরি সংক্রান্ত দর কষাকষিতে মজবুত হয়। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ছোটো কৃষকরা কৃষি-মজুরদের বর্ধিত মজুরি দিতে গিয়ে নিজেরা বিপন্ন হয়। এবারের বাজেটে কৃষকদের এই সমস্যাটির সমাধানের জন্যও প্রচেষ্টা হয়েছে। ২ হেক্টর বা ৫ একর বা ১৫ বিঘার কম জমির মালিক যে সমস্ত কৃষক তাদের জন্য বছরে ৬০০০ টাকা করে দেওয়া হবে, যাতে তারা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে পারেন। বর্তমানে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ কৃষকদের আত্মহত্যার মিছিলের মধ্যে এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষিঋণ মকুব করে দেওয়ার মাধ্যমে কৃষকদের

সমস্যার সমাধান করার কথা গত কয়েকমাস ধরে বিরোধীরা ক্রমাগত বলে আসছেন। নির্বাচনী বৈতরণী পেরোবার পক্ষে সেই সমাধান যথেষ্ট হলেও কৃষক ও কৃষির সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ কৃষিঋণ সেইসব চাষিরাই পান যাদের অনেক জমি আছে। কিন্তু তুলনায় ছোটো জমির মালিক যে সমস্ত কৃষকরা তারা খুব কম ক্ষেত্রেই কৃষিঋণ পান। অথচ চাষ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যায় সবচেয়ে বেশি তারাই পড়েন। কৃষিঋণ মকুবের সুবিধা পেয়ে যায় বড়ো চাষিরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান নীতির ফলে ছোটো চাষিরাই (অর্থাৎ যাদের ১৫ বিঘার কম জমি আছে) লাভবান হবেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ছোটো চাষিদের সংখ্যাই বেশি। ১৫ বিঘার বেশি জমির মালিকের সংখ্যা শতাংশের হিসেবেও আসে না। অতএব, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কৃষকই এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কৃষকরা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও কীটনাশক কিনতে পারবেন, ক্ষেতে উপযুক্ত সেচের বন্দোবস্তও করতে পারবেন। তাদের আর কৃষিঋণের প্রয়োজন হবে না। অনুদানে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ নিয়ে এই প্রকল্পকে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রকল্পে প্রদত্ত অর্থ আপাতদৃষ্টিতে কম বলে মনে হলেও চাষের সময় ছোটো কৃষকদের কাছে এই পরিমাণ অর্থই ভীষণ প্রয়োজনীয়।

দরিদ্র এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তর কথা ভেবে পদক্ষেপ করলেও এবারের বাজেট মধ্যবিত্তের কথাও মাথায় রেখেছে। এবারের বাজেটে আয়করে প্রচুর ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর আগে করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল বছরে আড়াই লক্ষ টাকা। এবারে বাজেটে তার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। যদিও এই ব্যাপারটিকে নিয়ে নানারকম অপপ্রচার চলছে। কোনও কোনও সর্বাধিক বিকৃত দৈনিকের পাতায় এই কর ছাড়ের সম্বন্ধে রিবেট নির্ভর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এতে পাঁচ লক্ষ টাকা বেশি আয়ের ব্যক্তিদের কোনও সুবিধা হবে না। বিশ্লেষণে একথাও বলা হয়েছে যে, এর আগে

বাজেট কথাটার আক্ষরিক অর্থ হলো শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের হিসেব কিন্তু এবারের বাজেট তার মৌলিক বিশেষত্বের কারণে শুধুমাত্র শুষ্ক হিসেবের কচকচির বদলে হয়ে উঠেছে জাতীয় অর্থনীতির দিনবদলের দিক্‌নির্দেশক।

রিবেটের পরিমাণ ছিল ২৫০০ টাকা বর্তমানে রিবেটের পরিমাণ হয়েছে ১২৫০০ টাকা এটুকুই তফাত। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। রিবেট নির্ভর ব্যাখ্যাতেই দেখা যাক, এতদিন করমুক্ত আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা, আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৫ শতাংশ হারে মোট ১২৫০০ টাকা এর ওপর রিবেট ছিল ২৫০০ টাকা। অর্থাৎ এতদিন বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা আয় করা ব্যক্তি ট্যাক্স দিতেন বছরে ১০০০০ টাকা আর বছরে ছয় লক্ষ টাকা আয় করা ব্যক্তি ট্যাক্স দিতেন বছরে ৩০০০০ টাকা [{(৬০০০০০-৫০০০০০) x ২০/১০০}+১০০০০]। বর্তমান নিয়মে রিবেট নির্ভর ব্যাখ্যাতে করমুক্ত আয় রইল আড়াই লক্ষ টাকা, আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ট্যাক্সের পরিমাণ ৫ শতাংশ হারে মোট ১২৫০০ টাকা এর ওপর রিবেট হলো ১২৫০০ টাকা। অর্থাৎ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ট্যাক্সের পরিমাণ ৫ শতাংশ হারে মোট ১২,৫০০ টাকা। এর ওপর রিবেট হলো ১২,৫০০ টাকা। অর্থাৎ বছরে ৫ লক্ষ টাকা আয় করা ব্যক্তি ট্যাক্স দেবেন বছরে ০ টাকা (অর্থাৎ ট্যাক্স দেবেন না) আর বছরে ছয় লক্ষ টাকা আয় করা ব্যক্তি ট্যাক্স দেবেন বছরে ২০০০০ টাকা {(৬০০০০০-৫০০০০০) x ২০/১০০}। অর্থাৎ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার কম এবং বেশি আয় করা উভয় প্রকার ব্যক্তিই এর ফলে উপকৃত হবেন। অর্থবরাদ্দের দিক দিয়ে তুলনায় ন্যূন হলেও এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত আরেকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো কামধেনু যোজনা। এই যোজনার ফলে দেশের মোট দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বাজারের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য হ্রাস পাবে। অর্থাৎ দুধের দাম কমবে ফলে গরিষ্ঠসংখ্যক দেশবাসী পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধসেবনে সক্ষম হবে। ফলস্বরূপ আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে শিশুরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি (স্বাধীনতার সাত দশক পরেও যা পর্যাপ্ত নয়) পাবে। ফলে মানবসম্পদের উন্নতি ঘটবে এবং দেশবাসীর শারীরিক ও বৌদ্ধিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতি তো ঘটবেই, তার সঙ্গে সামাজিক ন্যায়ও সাধিত হবে।

এতক্ষণ ধরে বাজেটের একটি দিক অর্থাৎ ব্যয়ের দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, আলোচনার প্রতি মুহূর্তেই পাঠক সাধারণের মনে এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঁকি মেরেছে যে সরকার ব্যয়ের ব্যাপারে এত উদার হচ্ছে কী করে? প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে আমাদের তাকাতে হবে বাজেটের অপর দিক অর্থাৎ আয়ের দিকে, দেখতে হবে ব্যয়বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার আয় বৃদ্ধি করলো কী করে? আর দেখতে গিয়ে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাবো অতীতের পাতায়। বিমুদ্রীকরণের সময় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হিসেব-বহির্ভূত যে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়েছিল, আয়কর দপ্তরের চিরুনি তল্লাশিতে যে টাকার ওপর ধার্য আয়কর দেশের মোট আদায়ীকৃত আয়করের পরিমাণ অর্থাৎ বাজেটের খাতায় সরকারের আয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে ও সরকারি আয়-ব্যয় ঘাটতি সামলে জনস্বার্থে এত খরচ করার সুযোগ দিয়েছে।

বাজেট কথাটার আক্ষরিক অর্থ হলো শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের হিসেব কিন্তু এবারের বাজেট তার মৌলিক বিশেষত্বের কারণে শুধুমাত্র শুষ্ক হিসেবের কচকচির বদলে হয়ে উঠেছে জাতীয় অর্থনীতির দিনবদলের দিক্‌নির্দেশক। ■

মাতৃশক্তির উত্থান না হলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্ব সৃষ্টিতে নারী আর পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব আছে। 'নারী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন, 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" অপরদিকে 'মানসী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/ আপন অন্তর হতে।' কবিতাটির শেষে গিয়ে তিনি বলছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' এখানে পুরুষের চোখে নারী, কবির নিজস্ব মতামত। একটা 'আমি' এসে যাচ্ছে। তার মানে নারী কি অন্যের অধীন সাপেক্ষ হয়েই বেঁচে থাকবে?

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতা লিখছেন তখন তিনি ৩৪ বছরের যুবক; ১৩০২ বঙ্গাব্দ, উনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষে, বঙ্কিমের মৃত্যুর কিছু পরে।

এই রবীন্দ্রনাথই তার দ্বিগুণ বয়সে গিয়ে লিখলেন (১৯২৯) উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। সেখানে নারীর দুঃসাহসী যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে ৩৫ বছর আগেকার নারীকে চেনা যায় না, চেনা যায় না আগের রবি-ঠাকুরকেও। লিখছেন,

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। তারি রথ নিত্যই উধাও.../ দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে/তোমা হতে বহুদূরে/মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম.../ ফিরিবার পথ নাহি/ দূর হতে যদি দেখ চাহি/ পারিবে না চিনিতে আমায়।/ হে বন্ধু বিদায়।...'

প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিল সুতো কারখানার নারী শ্রমিকেরা, তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। এই নিউইয়র্কই ১৯০৯ সালে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীবাদীদের প্রচেষ্টায় ৮ মার্চ দিনটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ব নারী দিবস হিসাবে পালন করে চলেছে। ২০১৮ সালে নারী দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Time is now–Rural and Urban activists transforming women's lives'। 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাধারণ সভায় (৭ অক্টোবর, ২০১৮) মাতৃশক্তির উত্থান ও সম্মানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বৈদিক যুগ নারীবাদেরও সুবর্ণযুগ। ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা, প্রমুখ নারী ঋষির নাম পাওয়া যাচ্ছে; উপনিষদের যুগে সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদিনী নারী গার্গী, মৈত্রেয়ীর নাম জানা যায়, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মহিয়সী নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদীর নারী জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান মেলে।

'বৃহদারণ্যক'-এ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রীর গল্প আছে। ঋষি যাবেন বাণপ্রস্থে, সব সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীকে ভাগ করে দিতে চান। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করছেন, নাথ! আপনি কেন যাচ্ছেন?

ঋষি : অমৃতের সন্ধানে।

মৈত্রেয়ী : পার্থিব সম্পদ দিয়ে কি লাভ করা যাবে সেই পরম শ্রেয়কে?

ঋষি : সম্ভব নয়।

মৈত্রেয়ী : যে নাহং নামৃতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্য্যাম্? (যা আমায় অমৃতত্ত্বে সহায়তা করবেই না, তা আমার কী প্রয়োজন?) প্রাচীন ভারতীয় নারী জানতেন জীবনের পরম লক্ষ্য কী!

স্মৃতির যুগে কেন নারীর অবনতি হলো তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ জরুরি, বামৈস্লামিক ইতিহাসকাররা সেই ইতিহাস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। বিদেশি শক্তির কাছে ভারতীয় সম্পদ কী শুধুই ধন-দৌলত আর মশলাপাতি ছিল? অবশ্যই ছিল ভারতীয় নারীর সুললিত দেহটাও। মুসলমানি আগ্রাসনে নারী লুণ্ঠনের ভয়ংকর প্রবণতার জন্য যদি হিন্দু-সমাজপতিরা বাধ্য হয়ে থাকেন নারীকে পর্দানশিন করে রাখতে, তার জন্য হিন্দুধর্মকে এত গালমন্দ করার প্রয়োজন থাকে না। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও হিন্দু-সমাজ যখনই সুযোগ পেয়েছে নারীর যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছে; তাই দেখি বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের অলোক-বন্দন।

মুসলমানি অন্ধকার যুগেও যখন সুযোগ ঘটেছে কোথাও কোথাও ঐশী সাধিকার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে 'ভক্তি আন্দোলন'-কে কেন্দ্র করে। মীরাবাই, মুক্তাবাই, আক্কা মহাদেবী, রানি ভবানী, খনা, লীলাবতীর মতো বিদূষী নারীরা জন্মেছেন ভারতবর্ষে।

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; স্বামীজী বলছেন, 'He was the saviour of women.' তিনি নারীদের পরিত্রাতা; মাতৃভাবের পূজারি তিনি, মা ভবতারিণী তাঁর আরাধ্যা আর নারীরা সেই জগজ্জননীর প্রতিভূ। রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়কে তিনি সাধনভূমি বানালেন; তন্ত্র সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী হলেন তাঁর গুরু। সাগ্রহে সারদাদেবীকে গ্রহণ করে সাধনার জপমালা অর্পণ করলেন তাঁকে; কৃপা করলেন নটী বিনোদিনী, গৌরী মা, গোপাল মা-কে।

আমাদের সমাজে যেটা দরকার মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, সামনের সারিতে উঠে আসা। মনে করানোর এই সংকল্প; নারীকে খাঁচাবন্দি করে রাখার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব। পরিবারে নারীর উন্নতি না হলে পরিবারের উন্নতি হবে না; পরিবারের উন্নতি ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়; সমাজের উন্নতি বিনা জাতির উন্নতি অসম্ভব। যারা ভূমির চাইতে নারীর হাট বেশি বিস্তৃত করতে চান, তারা সাবধান! লাভ-জেহাদিদের ছোবল থেকে ভারতীয় নারীকে বাঁচাতে সহায়তা করুন; তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতে বাবা-মা সহায়তা করুন; সর্বত্র ভারতীয় কন্যার মানসিক শক্তি বাড়াতে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক-অধ্যাপক, সমাজসেবীরা এগিয়ে আসুন। ■

সংবাদ প্রতিবেদন

ভারতকে আবার টুকরো করার ছক

মুসলমান সাংসদ বৃদ্ধির দাবি মুসলমান নেতার

আসাদুদ্দিন ওয়াইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিম (এ আই এম আই এম) দলের সভাপতি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি দাবি তুললেন ভারতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মুসলমান সাংসদের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তবেই নাকি এদেশের 'সেকুলারিজম' রক্ষা পাবে। তাঁর আরও বক্তব্য মোদী বনাম রাহুল লড়াই তুলে ধরার চেষ্টা হওয়ায় আখেরে 'সেকুলার' আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে আর এতে মোদী এবং আর এস এসেরই সুবিধা হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা আগাগোড়াই বলে আসছেন 'মহাগঠবন্ধন'-এর নামে যা হচ্ছে, তা আদতে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং সবাই প্রধানমন্ত্রী পদলোভী। এরা কেউই কোনও একজনকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরতে রাজি হবে না। তবে ওয়াইসির সাক্ষাৎকার আরও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল ভারতের রাজনৈতিক পরিসর দখল করে 'লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান'-এর স্লোগান সফল করতে ঘোলা জলে মাছ ধরার খেলায় আঁটোসাঁটো পরিকল্পনা করেই এগোচ্ছে জেহাদি মুসলমানরা। এ আই এম আই এম প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আসন্ন নির্বাচনে আপনার দলের মূল ইস্যু কী? কোনও রাখঢাক না করেই আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জানিয়ে দেন ভারতের ২৫টি পিছিয়ে পড়া জেলার, যার মধ্যে দশটি আবার সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমান অধ্যুষিত তার অনুন্নয়নকে হাতিয়ার করে প্রচারে নামবেন তাঁরা। রাজনৈতিক মহলের মতে যে পঁচিশটি জেলাকে ওয়াইসির দল চিহ্নিত করতে চাইবে, দেখা যাবে সেগুলির অধিকাংশই অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত। এর পরের প্রশ্নেই অবশ্য ঝুলি থেকে বেড়াল বের করে ফেললেন মুসলমান নেতাটি। সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের কোন ভূমিকায় দেখতে চান তিনি? ওয়াইসি অকপটে বলে দেন, 'মুলুক কো বাঁচানা হ্যায়, সেকুলরিজম কো বঁচানা হ্যায়' স্লোগান আরও জোরদার হয় নির্বাচন এলেই। ওয়াইসির প্রশ্ন, সেকুলারিজমের দায়ভার একা মুসলমানরাই বহন করবে কেন? অতএব ভারতবর্ষে 'সেকুলারিজম নামক বস্তুটি রক্ষা করতে হলে মুসলমান সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই হবে।

ভারতের স্বাধীনতার আগে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগও মুসলমান সাংসদ বৃদ্ধির ঠিক একই দাবি তুলেছিল। কংগ্রেসের যে হিন্দু নেতারা জিন্নার দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন তাদের অপরিণামদর্শিতায় শুধু দেশভাগই হয়নি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম হিন্দুরা উদ্বাস্তু নারকীয় জীবন কাটিয়েছে, বর্তমান পাকিস্তান বাংলাদেশে হিন্দু-শূন্য পরিণতির দিকে তাকালেই বাহাত্তর বছর আগের ভয়াবহতা টের পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে আজও ঠিক সেই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতকে আরও টুকরো করে, হিন্দুদের সর্বস্বান্ত করার যে পরিকল্পনা বর্তমান জেহাদি মুসলমান নেতৃত্ব করেছে, সেদিনের মতো আজও এদেশের কিছু হিন্দু নেতা শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে তাতে শামিল হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের আরও অভিমত, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো তপশিলি জাতি-উপজাতির নেতা যেমন সেদিন জিন্নার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবে আজও মুসলমান নেতার তপশিলি অন্তর্ভুক্তদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিতদের সরংক্ষণ নেই কেন বলে বিজেপি যে প্রশ্ন তুলেছে তার সদুত্তর দিতে না পারলেও মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতা ওয়াইসি দলিত মুসলমানদের সাধারণ সমস্যা (অর্থাৎ মুখে না বললেও তাঁর ইঙ্গিত এদেশে এরা বিপন্ন এই প্রচার চালানো)-র পরিপ্রেক্ষিতে এক হওয়ার কথা বলে দলিতদের উস্কানোর পরিকল্পনাটিই স্পষ্ট করে দেন।

বৃদ্ধ শিল্পীদের জন্য কেন্দ্রের পেনশন এবং চিকিৎসা ভাতার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বৃদ্ধ শিল্পীদের আর্থিক এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ নিতে চায় কেন্দ্র। সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। জানা গেছে, যেসব শিল্পী সাহিত্যিক এবং গবেষক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন কিন্তু বৃদ্ধ বয়েসে কষ্টকর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রকল্প আনতে চলেছে। প্রকল্পের নাম, শিল্পীদের পেনশন এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা বলেন, দুঃস্থ এবং বার্ধক্যজনিত কারণে অক্ষম শিল্পী-গবেষকদের পেনশন দেবার পাশাপাশি তাদের স্ত্রী এবং স্বামীদের চিকিৎসা সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই প্রকল্পে। চিকিৎসা ভাতা দেওয়া হবে স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, যেসব শিল্পী-গবেষকের বয়েস চল্লিশ বছরের কম তারা যেন এখনই অটল পেনশন যোজনার অধীনে এই নতুন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেন। ২০৩৫ সাল থেকে তাদের পেনশন চালু হয়ে যাবে। তবে এই প্রকল্পে যারা নাম নথিভুক্ত করবেন তারা কেন্দ্রের অন্য কোনও পেনশন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারেবেন না।প্রকল্পে যোগ দেওয়ার পর যদি কেউ মারা যান তাহলে তাঁর বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামীকে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া যাবে কিনা তা কেন্দ্রের বিবেচনাধীন। কেন্দ্র যদি মনে করে পরিবারটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় তাহলে পেনশন বন্ধ করা হবে না। চিকিৎসা ভাতাও দেওয়া হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক প্রকল্পে বিরাশি হাজার শ্রমিককে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সড়ক পরিবহণ এবং সড়ক মন্ত্রক সড়ক নির্মাণ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও সড়ক প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া একথা জানান। ১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের মাধ্যমে এইসব শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে ৯৫০০০ শ্রমিক তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

ইঁট গাঁথনি, বার বেন্ডিং, ভারা নির্মাণ, শাটারিং/ কাঠের কাজ, পাইপের কাজ এবং রঙের কাজে ইতিমধ্যে ৮২০০০ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অন্য আর একটি প্রশ্নের জবাবে মান্ডাভিয়া বলেন, আমাদের দেশে সড়ক নির্মাণের অন্যতম উপাদান হিসাবে রবারের ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে সড়কগুলির মান উন্নত হচ্ছে এবং বেশি টেকশই হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার দেশে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে তিনি জানান।

নতুন সংগ্রহালয় স্থাপনের ৩৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত

ড. মহেশ শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের সংগ্রাহালয়গুলির জন্য আর্থিক সহায়তা দেবার কর্মসূচি আগামী ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ থেকে এ পর্যন্ত নতুন সংগ্রহশালা স্থাপনের ৩৭টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. মহেশ শর্মা সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৫টি নতুন সংগ্রহালয়ের জন্য ৯৯৬৭৮৪৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, দেশের ১২টি রাজ্যে ৩৫টি নতুন সংগ্রহালয়ের জন্য ৭৩ কোটি ৬১ লক্ষ ১১ হাজার ৩৫৩ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দিল্লি রাজধানী অঞ্চলের নতুন দুটি সংগ্রহশালার জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাফেল চুক্তি সম্পাদনে কিছু শর্তকে এড়িয়ে যাওয়ার সংস্থান সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাফেল চুক্তির ক্ষেত্রে কিছু আবশ্যিক শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে এমন এক নবীনতম অভিযোগকে উড়িয়ে দিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। সরকারের সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত রাখতে প্রতিরক্ষা চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রদেয় চুক্তি অর্থের জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়া বা অর্থ ঢোকানোর সময় নির্দিষ্ট escrow A/c মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নিয়ম পালন করতে মোদী সরকার গাফিলতি করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে যে খবর চাউর হয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা তা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন।

দপ্তরের মত অনুযায়ী চুক্তি যখন দুটি সরকারের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে রূপায়িত হয় তখন নির্দিষ্ট সংস্থার সঙ্গে চুক্তির সময় যে আইনগত বিধানগুলি থাকে এক্ষেত্রে তা আর পালন করা আবশ্যিক থাকে না। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরবরাহ (Defence procerement procedure) এর নির্দেশাবলী উদ্ধৃতি করেই তাঁরা এ বক্তব্য পেশ করেছেন।

সম্প্রতি 'দি হিন্দু' দৈনিক পত্রিকায় এক

প্রতিবেদনে এই বিষয়টিকে অভূতপূর্ব গাফিলতি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস এই সুবাদে চুক্তিটি চালু প্রক্রিয়াকে লঙ্ঘন করেছে বলে শোরগোল তুলে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তর আরও জানিয়েছে যে বন্ধুভাবাপন্ন দুটি সরকারের মধ্যে ভূকৌশলগত সুবিধে (geostrategic advantats) তৈরি করা বা উভয়ের কোনো একটি দেশের সামরিক প্রয়োজনে দ্রুত প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা যখন জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তখন ওই চিরাচরিত নিয়মাবলীর শর্তাধীন থাকা যে আবশ্যিক নয় তা দপ্তরের নির্দেশগ্রন্থেই উল্লেখিত আছে। কোনো বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রেই চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংস্থার বিশ্বস্ততার নিশ্চয়তা হিসেবে শুধু নয় তারা সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো দালাল বা তৃতীয় পক্ষের নষ্ট না করতে পারে তা নিশ্চিত করতেই উল্লেখিত বিষয়গুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়। দুটি সরকার সরাসরি জড়িত থাকলে এ বিধি বাধ্যতামূলক কখনই নয়।

এই সূত্রে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতকে দেওয়া তাদের বয়ানে প্রতিরক্ষা দপ্তর দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জাম কেনা গড়পড়তা বাজার থেকে বাণিজ্যিক মালপত্তর কেনার পর্যায় পড়ে না। এর কারণ সরবরাহকারীর নানান বাধ্যবাধকতা, প্রযুক্তিগত জটিলতা, বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ও সর্বোপরি চুক্তির ভূ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটিকে কী নজরে দেখবে প্রভৃতি বিষয়। তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে রাশিয়া বা আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে তথাকথিত বিশ্বস্ততার শর্তটি নেই। একই মিথ্যের অবতারনা আজ বহুমুখী মিথ্যার চৌরাস্তায় চলেছে বলে খবর।

হিন্দুদের ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যালঘু বলা যাবে কিনা জানতে চাইল সর্বোচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংখ্যাগতভাবে দেশের যে সমস্ত রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে সেখানে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে দেওয়া সুযোগ সুবিধেগুলি তারা পাবে না কেন এ প্রশ্ন তুলে দিল মহামান্য আদালত। আদালত এ প্রসঙ্গত তুলেছে যে এই সংখ্যালঘু ঘোষণার দায়িত্ব কী রাজ্য না কেন্দ্র কার ওপর বর্তাবে?

সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের করা এক আবেদনের ভিত্তিতে জানতে চাওয়া হয়েছে— যে সমস্ত রাজ্যে ধর্মীয় ভিত্তিতে অন্য ধর্মের লোকেরা (হিন্দু নয়) সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে বসবাসকারী হিন্দুরা সংখ্যালঘুর সুযোগগুলির অধিকার কেন পাবে না? আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত সংখ্যালঘু কমিশনকে এ বিষয়ে তিন মাসের সময়সীমার মধ্যে তাদের মতামত নির্দিষ্টভাবে আদালতকে জানাতে বলেছে।

বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ আর্জির উত্তরে আদালত প্রাথমিকভাবে সংখ্যালঘু কমিশনের অবস্থান বুঝে নিতে চাইছেন। তাৎপর্যমূলকভাবে আদালত বলেছে— 'এই মুহূর্তে আমাদের তরফে সরাসরি আবেদনটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার্য বিষয়ে না ঢুকে সংখ্যালঘু কমিশনের এখুনি এটি বিচার করা দরকার।' প্রথম বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও বিচারপতি সঞ্জয় খান্নার যুগ্ম বেঞ্চ ২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বরে দাখিল করা আর্জির অংশবিশেষ উল্লেখ করে বলেন জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর ও লাক্ষাদ্বীপে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে।

এই সূত্রে ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী লাক্ষাদ্বীপে হিন্দুর সংখ্যা ২.৫, মিজোরাম ২.৭৫, নাগাল্যান্ডে ৮.৭৫, মেঘালয়ে ১১.৫৩। জম্মু-কাশ্মীরে ২৮.৪৪ অরুণাচল প্রদেশ ২৯, মণিপুরে ৩১.৩৯ ও পঞ্জাবে ৩৮.৪০ শতাংশ। কিন্তু খাতায়কলমে অকাট্য ভাবে হিন্দুদের এই সংখ্যালঘু পরিসংখ্যানজাত ন্যায্য সুযোগ সুবিধেগুলি অন্য সম্প্রদায় নিজেদের চিরারচিত সংখ্যালঘু জাহির করে কেড়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয় হিন্দুদের প্রাপ্য এই বিশেষ অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বেআইনি ভবে ও খেয়ালখুশিমতো অপব্যবহার করছে। এর অন্যতম কারণ কী কেন্দ্রীয় সরকার কী রাজ্য সরকার কখনই আইনগত ভাবে সরকারি সূচনা দেয়নি। যেখানে হিন্দুকে সংখ্যালঘু আইন মোতাবেক সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরি যে, ইতিপূর্বে শ্রী উপাধ্যায়ের আদলতে দাখিল করা এই সংক্রান্ত আর্জি আদালত নিতে অস্বীকার করে সংখ্যালঘু কমিশনে সরাসরি আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সাম্প্রতিক আবেদনে আবেদনকারী সংখ্যালঘু কমিশনের গোচরে বিষয়টি দীর্ঘদিন পূর্বে জানানো সত্ত্বেও কোনো সাড়া না পাওয়াতেই যে আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন সে প্রসঙ্গটি উদযাপন করাতেই আদালতের এই নির্দেশ।

নওয়াজের ঠাকরে

বাল থ্যাকারের ভূমিকায় নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়া চরিত্রগুলির ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা সারা বিশ্বেই অনুসৃত। জীবনী চিত্রের ফলে নবীন প্রজন্ম অতীতের নানান ক্ষেত্রের বর্ণময় চরিত্রদের পর্দায় তাঁদের কিছুটা প্রতিবিম্বিত জীবনের স্বাদ পান। জীবনীচিত্রের ঝুঁকি হচ্ছে বর্ণিত চরিত্রটিকে অনেক ক্ষেত্রেই larger than life করে তোলা। পরিচালক রিচার্ড অ্যাটেনবরো যতই সত্যজিৎ রায়ের বন্ধু হোন না কেন বিশ্ব সমাদৃত 'গান্ধী' ছবিতে তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস নামে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিই গ্রাহ্য করেননি। সেই ১৯৮৩ সালে জোরালো প্রতিবাদ হয়েছিল বলে তথ্য নেই। আজকাল কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্ভর চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীতে মনোমতো না হলেই হাঙ্গামা হুজ্জুত হচ্ছে। ইন্দু সরকার, অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ইত্যাদি।

সম্প্রতি শিবসেনা দলের প্রবর্তক বাল কেশব থাকরের নামাঙ্কিত 'ঠাকরে' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। ২ ঘণ্টা ৯ মিনিটের ছবিটির প্রযোজক ও কাহিনি লেখক তাঁরই সহকর্মী সাংসদ সঞ্জয় রাউত। পরিচালক অভিজিৎ পানসে কিন্তু পরিচালকের স্বাধীনতার যথেচ্ছ প্রয়োগ করেননি। ঠাকরের চরিত্রের ও তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণগুলির মধ্যে রাজনৈতিক উন্মাদনা তৈরির পর্যাপ্ত ইন্ধন থাকলেও পরিচালক অতি চিত্রণে সংযত ছিলেন। ষাটের দশকের মুম্বইকে ধরতে ছবির প্রথম ভাগের অধিকাংশ চিত্রগ্রহণ সাদা-কালোয় কম্পিউটার গ্রাফিক শটে। এতে সময়টি অনুভব করা সহজ হয়েছে। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর ঠাকরে আদালতে গিয়ে বিষোদ্‌গার করে বলেছেন তাঁর লোকেরাই বাবরি ধাঁচা ধ্বংস করেছে। এই দৃশ্যে পরিচালক আদালত যে জনসভা মঞ্চ নয় তা প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। কার্টুনিস্ট থেকে জাত্যভিমানী প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিমজ্জিত ঠাকরের রূপান্তরকে আগাগোড়া বিশ্বস্ত করে তুললেন আজকের মুম্বই চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে নিজের বুধানা গ্রামে মুসলমান হিসেবে রামলীলায় কুশীলব হওয়ায় নওয়াজ বেদম প্রহৃত হয়েছিলেন। পাশে দাঁড়ান আদিত্য ঠাকরে। ঠাকরে খুব নিকট অতীতের চরিত্র হওয়ায় স্মরণে আসে তিনি দিলীপকুমারের মতো প্রবাদপ্রতিম অভিনেতাকেও পরিস্থিতি সাপেক্ষে ভারত ছাড়ার হুমকি দিতে ইতস্তত করেননি। ঠাকরে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও মরাঠা মানুষের প্রতি আপোশহীন দায়বদ্ধতা। ছবিতে নওয়াজ কখনই মরাঠা উচ্চারণ অনুকরণের প্রচেষ্টা নেননি। যাঁরা একেবারে প্রথমদিকে পরিচালক সুজয় ঘোষের সুপার ডুপার হিট 'কহানী' ছবিতে তাঁকে ডাবল ক্রশ সিবিআই অফিসারের ভূমিকায় দেখেছিলেন তারা 'ঠাকরে'তে তাঁর অভিনয়কলার চূড়ান্ত উত্তরণ দেখার সুযোগ পাবেন। কিছুকাল আগেই অবিভক্ত ভারতের জনপ্রিয় গল্পকার কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত কাশ্মীরি সাদ্দাত হোসেন মান্টোয় যাঁরা, তাঁর কাজ দেখেছেন তাঁরা দেখবেন কী মসৃণতায় নওয়াজ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চিৎকৃত অভিনয় এড়িয়ে একা ছবিটিকে টেনে নিয়ে গেলেন। ইতিহাসের বিচিত্র পরিহাসে নওয়াজকেই নিখাদ হিন্দুত্বের প্রবক্তাকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে হলো।

ঠাকরের নেতা হয়ে ওঠার প্রথম দিকে সংযুক্ত মরাঠা সমিতি গঠনের মাধ্যমে মরাঠাদের জন্য পৃথকরাজ্যের দাবিতে আন্দোলন, একই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদিকে পর্যায়ক্রমে ছুঁয়ে গেছেন পরিচালক। তবে চিত্রনাট্যের ঠাস বুনোটের অভাবে অনেককিছুই কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। এগুলি নগণ্য ব্যতিক্রম। ছবিতে বাড়তি পাওনা অর্ধশতাব্দী আগেকার মুম্বাই ও ঠাকরের সমসাময়িক তুমুল সক্রিয় বর্ণাঢ্য রাজনীতিক জর্জ ফার্নান্ডেজ, শারদ পাওয়ার, ওয়াই বি চবনদের স্বনামে চাক্ষুষ উপস্থিতি। এছাড়া চলচ্চিত্রপ্রেমী ঠাকরের জীবনালেখ্যে ঘোরাফেরা করেছেন সমকালীন মুম্বইয়ের বহু ঝকঝকে তারকারাও। ∎

সাপ্তাহিক রাশিফল

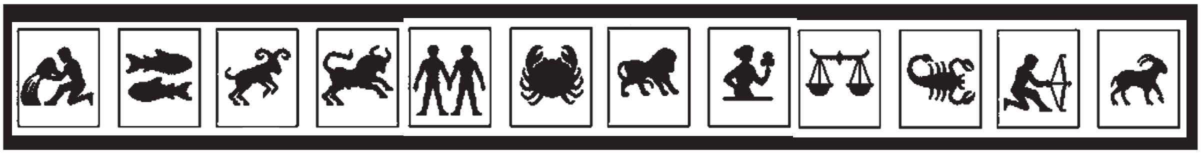

১৮ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে মঙ্গল, কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শুক্র-শনি, মকরে রবি-কেতু, কুম্ভে রবি-বুধ। বুধবার সকাল ৯-৪২ মিনিটে রবির কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্র থেকে তুলায় স্বাতী নক্ষত্রে।

মেষ : উদ্যমী, রোগমুক্ত, ভ্রাতা-ভগ্নী ও প্রতিবেশীর সহযোগিতা, কর্মে দক্ষতা ও প্রশংসা। বিদ্যার্থীর মনঃসংযোগের অভাব ও চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় অনুকূল। প্রেম-প্রীতি ভালবাসায় পূর্ণতা ও অভিনয়ে যশ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। নিকট ভ্রমণ ও বাক্‌পটুতায় সম্মান। গৃহ সংস্কার। দাঁতের চিকিৎসায় ব্যয়।

বৃষ : বিদ্বান, পুত্রবান, শৌখিনতা, উদারতা, প্রভাবী, স্বাভিমানী, উন্নত রুচি ও সৌন্দর্যের উপাসক। পুত্র সন্তানের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, গবেষণা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য ও কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞের প্রগতির প্রশস্ত পথ। স্ত্রীর জেদের কারণে মাতুলের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্মান হানি।

মিথুন : শিশুর সারল্য, সম্পত্তি ও গবাদি পশু থেকে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। বস্ত্র, ওষুধ, স্বর্ণ ও শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। প্রত্যুৎপন্নমতি যুক্তিবাদী ও দূরদর্শিতায় প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। সহোদরের কর্মলাভের সম্ভাবনা। সাহিত্য ও কলাকুশলীদের নিষ্ঠা ও বিনয়ীর সম্মান। শরীরের মধ্যাংশের চিকিৎসার প্রয়োজন।

কর্কট : গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সন্তান-সন্ততি ও গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ। সারল্য-সততা, শ্রদ্ধায় চিত্ত প্রসন্ন ও সমাজে শুচিতার ব্যাপ্তি। বকেয়া কাজের পরিসমাপ্তি হলেও ব্যবসায়ীদের অসাবধানতায় লোকসানের সম্ভাবনা। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান ও যুবকবন্ধু হিতকারী।

সিংহ : সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নী ও পুত্র সন্তানের নতুন কর্মে যোগদান ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি। ঝুলে থাকা কাজ সম্পন্ন ও ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ। বাড়ি, গাড়ি ও তীর্থ ভ্রমণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সন্তান- সন্ততির কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শুভদায়ক। সমাজকল্যাণ ও পেশাগত কর্মজনিত যশ ও প্রতিপত্তি। শরীরের মস্তক ও মুখমণ্ডলের চোট-আঘাতের সম্ভাবনা।

কন্যা : কর্মে অনীহা, আয়ের শ্লথ গতি অথচ ব্যয় বাহুল্যের চাপ। মাতার স্বাস্থ্য হানি ও কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিবেশ। বিদ্যার্থী, সাহিত্য পিপাসু খেলোয়াড়, পুলিশ, মিলিটারি সাফল্যের অনেক পালক যোগ যা সমাজে সম্মান পরিব্যাপ্ত হবে। সপ্তাহের শেষাংশে হতাশার অবসানে নিজ যোগ্যতায় প্রতিভার বাস্তবায়ন।

তুলা : আইনজ্ঞ, শল্যচিকিৎসক, কূটনীতিজ্ঞ, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পশুচিকিৎসকের বুদ্ধি, কৌশল ও দূরদর্শিতায় যশ-খ্যাতি, বিভক্ত আভিজাত্য গৌরব। বিদ্যার্থী, গবেষকের নব্য ভাবনার উন্মেষ, ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও শংসা প্রাপ্তি। গৃহে পরিণয়, স্বজন বাৎসল্য, সুস্বাস্থ্য ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

বৃশ্চিক : প্রখর স্মরণশক্তি, তার্কিক, কলাবিদ্যায় রুচি, আদর্শনিষ্ঠ নির্দিষ্ট বিচারধারায় উদ্যোগী, মননশীল, কর্তব্যপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধ্যেয়নিষ্ঠায় সৌভাগ্যের সোপানে উন্নীত। প্রেম-প্রণয় থেকে পত্নীরূপের বাস্তবায়ন। ছিদ্রান্বেষীর কারণে কর্মক্ষেত্রে সুস্থিতি বিনষ্ট ও ভ্রমণে সতর্কতা প্রয়োজন।

ধনু : প্রশাসনিক কাজে ন্যস্তদের কর্মস্থানে সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস বুদ্ধিমত্তায় ও উদারভাবে প্রতিহত করুন। গৃহিণী ও জ্যৈষ্ঠভ্রাতার অসুস্থতা ও নিজ অসতর্কতায় দুর্ঘটনায় সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী, ভ্রাতা-ভগ্নী ও সন্তানের জ্ঞানার্জনে প্রবাস। ব্যবসায় উন্নতি ও পরিণয়। ব্যয়াধিক্যের কারণে নিজেকে শান্ত-সংযত রাখুন।

মকর : শরীরের যত্ন, চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা, নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত, ব্যয়বাহুল্য ও মান-সম্মান বিষয়ে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কৌশলে সমস্যা সমাধান। পাবলিশার্স, খামারবাড়ি, লৌহজাত দ্রব্য ও জলজ ব্যবসায় বিত্ত ও প্রতিপত্তি। পৈতৃক বিষয় ও গুরুজনের পরামর্শ হিতকতারী, নীতিগত ব্যাপারে সমঝোতা শ্রেয়। বিদ্যার্থীর জ্ঞান-প্রজ্ঞায় দেব-দেবীর কৃপা লাভ।

কুম্ভ : উপার্জনের নতুন দিশার সন্তান ও সমাজকল্যাণে কর্ম দক্ষতা ও প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর। দৃঢ় প্রত্যয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নব চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক ও প্রতিকূল, পরিবেশের অবসান। কথাবার্তায় প্রফুল্লতা ও গৃহসুখ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের চাপমুক্তি ও অটুট মনঃসংযোগ। ভ্রমণ ও ঝুঁকিবহুল কাজ পরিতাজ্য।

মীন : বিদ্যার্থীর পরীক্ষাভীতি ও নৈরাজ্যের দিনলিপিতে বিহ্বল চিত্ত। বয়স্ক মিত্র ও বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, বুদ্ধির কারণে সময় ও অর্থের অপচয়। হঠাৎ অসুস্থতা ও দীর্ঘ রোগভোগের সম্ভাবনা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে তমসা আঁধারে নতুন আলোকবর্তিকা। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্তদের স্বীকৃতি ও সম্মান।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য